Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসলিমা

রোলঃ 23090121033

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসলিমা

রোলঃ 23090121033

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসলিমা, আইডিঃ 23090121033 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাসলিমা

(স্বাক্ষর)

তাসলিমা

আইডিঃ 23090121033

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....1

১.১ভূমিকা:.....1

১.২ ইসলামে নামাজের সামগ্রিক গুরুত্ব ও ফজিলত.....1

১.৩ইসলামে নামাজের স্থান ও মর্যাদা.....9

১.৪ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজের পার্থক্য.....11

অধ্যায় ২: নফল নামাজের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ.....14

২.১ নফল নামাজের অর্থ ও শাব্দিক বিশ্লেষণ.....14

২.২ ইসলামী পরিভাষায় নফল নামাজের সংজ্ঞা.....14

২.৩ নফল নামাজের প্রকারভেদ.....15

(১)তাহাজ্জুদ:.....15

(২) ইশরাক নামাজ.....28

(৩) চাশত নামাজ (দোহা নামাজ): 30

(৪) আওয়াবীন নামাজ.....32

(৫) সালাতুত তাওবা (তওবার নামাজ).....33

(৬) সালাতুল হাযত(প্রয়োজনের নামাজ):.....34

(৭) সালাতুল ইস্তেখারা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার নামাজ).....35

(৮)তাহিয়্যাতুল অযুর নামাজ:.....37

(৯)যাওয়ালের নামাজ: 38

(১০)সালাতুত তাসবীহ:.....39

(১১)সালাতুল ইস্তিস্কা:.....40

(১২)দুখুলুল মাসজিদ নামাজ:.....40

(১৩)চন্দ্র ও সূর্য গ্রহনের নামাজ :.....41

২.৪ নফল নামাজের সময়.....42

নফল নামাজের মাকরূহ সময়:.....42
অধ্যায় ৩: কুরআন ও হাদীসে নফল নামাজের গুরুত্ব.....46
৩.১ কুরআনের আলোকে নফল নামাজের গুরুত্ব.....46
৩.২ হাদীসের আলোকে নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত.....49
৩.৩ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমল ও শিক্ষা.....51
৩.৪ সাহাবায়ে কেরামের নফল নামাজে আগ্রহ ও আমল.....55
অধ্যায় ৪: নফল নামাজের আত্মিক ও মানসিক প্রভাব.....57
৪.১ আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া বৃদ্ধি.....58
৪.২ মন ও শরীরের প্রশান্তি.....62
৪.৩দুঃখ-কষ্টে নফল নামাজের ভূমিকা.....63
অধ্যায় ৫: নফল নামাজের ফজিলত ও পুরস্কার.....64
৫.১ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন.....64
৫.২ জান্নাত লাভের আশাবাণী.....65
৫.৩ গোনাহ মাফের উপায় হিসেবে নফল নামাজ.....66
অধ্যায় ৬: উপসংহার.....68

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ভূমিকা:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নিকটে আত্মসমর্পণ করে।
ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ হলো নামাজ। এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ, ঈমানের পরেই এর স্থান।এটি এমন একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে।

নামাজ শুধু শারীরিক উপাসনা নয়, বরং এটি আত্মার পবিত্রতা, মনোশান্তি, নৈতিক শুদ্ধতা ও আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গঠনের মাধ্যম। ইসলামে ফরজ নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।
নফল নামাজ এমন এক ইবাদত যা বাধ্যতামূলক নয়, তবুও এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

বর্তমান যুগে মানুষ ব্যস্ততা, মানসিক চাপ, ভয় ও অস্থিরতায় আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে নফল নামাজ মানুষকে প্রশান্তি, ধৈর্য ও আল্লাহর স্মরণে স্থিরতা প্রদান করে। তাই নফল নামাজ শুধু আখিরাতের মুক্তির নয়, বরং দুনিয়ার শান্তিরও এক অমূল্য চাবিকাঠি।নফল নামাজের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর নিকট আরো ঘনিষ্ঠ হয়, গোনাহ মাফ হয় এবং আত্মা পবিত্র হয়।

১.২ ইসলামে নামাজের সামগ্রিক গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআনে নামাজ প্রসঙ্গে

নামাজ ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভগুলোর একটি। নামাজ শুধু দেহের ক্রিয়া নয়, বরং এটি আত্মার প্রশান্তি, অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং জীবনের দিকনির্দেশনা।
কুরআনে মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমানের পরেই বলা হয়েছে নামাজের কথা। ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

“(মুত্তাকী তারা,) যারা গাইবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।” -সূরা বাকারা (২) : ৩

লক্ষ করার মতো বিষয় হল, আল্লাহ তাআলা ঈমান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। আর নামাজের বিধান দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বালোকে নিয়ে। সাত আসমান পার করে আল্লাহর কাছে নিয়ে এই মহান গুরুত্বপূর্ণ উপহার ও ইবাদত দান করেছেন। অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। সুতরাং এই ইবাদত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সেই ইবাদতেই মুমিনের বিরাট সফলতা নিহিত।

.সেজন্য কুরআন মাজীদে সফল মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে-

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

“যারা নামাজে বিনয়াবনত।” -সূরা মুমিনূন (২৩) : ২

এরপর আরো কয়েকটি গুণ উল্লেখ করে শেষে আবার বলা হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

“যারা নামাজের ব্যাপারে যত্নশীল।” -সূরা মুমিনূন (২৩) : ৯

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব ও মেযাজ প্রসঙ্গে প্রথমে বলেছেন-

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا، وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا، اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ،الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ.

“বস্তুত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে লঘুচিত্তরূপে। যখন তাকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। আর যখন তাকে স্বচ্ছন্দ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ। তবে নামাজী ব্যক্তিরা ছাড়া। যারা তাদের নামাজ আদায় করে নিয়মিত।” -সূরা মাআরিজ (৭০) : ১৯-২৩

এখানে মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা ছাড়িয়ে অর্জনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন নামাজের কথা। এরপর বেশ কয়েকটি গুণ উল্লেখ করার পর আবার বলেছেন-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ .

“এবং যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে। তারাই জান্নাতে থাকবে। সম্মানজনকভাবে।” -সূরা মাআরিজ (৭০) : ৩৪-৩৫

আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য আয়াতে নামাজের আদেশ দিয়েছেন। যেমন—

“তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত দাও; আর তোমরা রুকূ করো তাদের সঙ্গে যারা রুকূ করে।”(সূরা আল-বাকারা: ৪৩)

হাদিস শরীফে নামাজ প্রসঙ্গে

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নামাজের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ.

"দ্বীনের প্রধান বিষয় হল ইসলাম। এর খুঁটি হল নামাজ। আর তার উচ্চচূড়া হল জিহাদ।" -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬

এখানে নামাজকে বলা হয়েছে ইসলামের খুঁটি। যেকোনো অবকাঠামোর ক্ষেত্রে খুঁটির গুরুত্ব কতটুকু তা খুব সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, ঈমানের পর নামাজই প্রথম। যেজন্য কুরআন-হাদীসে ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামাযেরই উল্লেখ বারবার। আখেরাতেও সর্বপ্রথম বিষয় নামাজ। হাদীস শরীফে এসেছে-

"কিয়ামতের দিন বান্দার আমলগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের।" - জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৬৬

বোঝা গেল, দুনিয়াতে যেমন, তেমনি আখেরাতেও নামাজের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয়েছে-

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.

"নিশ্চয় একজন মানুষ ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্যরেখা হল নামাজ।" -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২

এ আমলে অবহেলা যেমন বড় অন্যায়, যথাযথ আদায়ে নেকী ও প্রাপ্তিও অনেক বড়। এর মাধ্যমে বান্দার গোনাহ ধুয়ে-মুছে যায়। ইরশাদ হয়েছে-

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

"পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত হল তোমাদের কারো (ঘরের) দরজার সামনে দিয়ে প্রবাহিত বড় নদীর মতো। যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।"-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৪

হাদীসটি অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে আছে। তাতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এভাবে পাঁচবার গোসল করলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? পারে না। তারপর বলেছেন-

فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ.

"নিশ্চয় নামাজ গোনাহসমূহকে তেমনিভাবে দূর করে দেয়, যেমন পানি শরীরের ময়লা দূর করে দেয়।" -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৩৯৭

অর্থাৎ নিয়মিত নামাজ পড়তে থাকলে নামাজী হবে পবিত্র ও গোনাহমুক্ত। তবে কবীরা গোনাহ হলে অবশ্যই তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হবে। ইরশাদ হয়েছে-

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

"পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান- মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবীরা গোনাহ ছাড়া।"-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন:

"কিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামাজের বিষয়ে। যদি নামাজ ঠিক থাকে, তবে অন্যান্য আমলও ঠিক থাকবে।"
(তিরমিযি)

নামাজ ইসলামের মূল স্তম্ভ।রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত — (১) কালেমা শাহাদাত, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান, (৪) রমজানে রোযা রাখা এবং (৫) হজ পালন করা।"
(সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নামাজ ইসলামী জীবনের অন্যতম ভিত্তি। একজন মুসলমানের ঈমানের পর প্রথম দায়িত্ব হলো নামাজ আদায় করা।

সাহাবীদেরকে নামাজে উৎসাহদান

হযরত রাবীআ ইবনে কা'ব আলআসলামী রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করলাম। তখন আমি তাঁর কাছে ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে কোনো কিছু চাও।
আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করছি।
তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু?
আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন-

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود.

"তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা (তথা নামায) আদায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।"-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৯

অর্থাৎ সিজদা ও নামাজ আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একবার সাওবান রা.-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

“বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা কর। নিশ্চয় তুমি একবার আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করলে তিনি তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৮

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামাজের গুরুত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, নামাজের প্রতি যেমন আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করতেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল তেমনি। নামাজকে তারা মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। নামাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, নামায ঠিক থাকলে অন্যান্য কাজকর্ম ঠিক থাকবে। নামাজে ত্রুটি থাকলে অন্যান্য কাজকর্মেও ত্রুটি ও অবহেলার আশঙ্কা থাকবে।

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রা. একবার ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে ফরমান পাঠালেন। সেখানে লিখলেন-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

“আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় করবে সে তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করবে (নামাজের ক্ষেত্রে অবহেলা করবে) সে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক নষ্টকারী (অবহেলাকারী) হয়ে থাকবে।” -মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬

তাবিয়ীন ও তাবে তাবিয়ীন যুগে

সাহাবায়ে কেরাম থেকে দ্বীন শিখেছেন তাবিয়ীনে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামকে দেখে দেখে তারা তাদের জীবন সাজিয়েছেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করে করে জীবন গড়েছেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের ছাপ ফুটে উঠেছে তাবিয়ীনে কেরামের মাঝে। জীবন যাপনের বাহ্যিক বিষয়াশয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-ইবাদতের ক্ষেত্রেও।

বিখ্যাত তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

مَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا وَسَعِيدٌ فِي الْمَسْجِدِ.

"চল্লিশ বছর ধরে অবস্থা এমন ছিল যে, আযান হচ্ছে আর সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (৯৪ হি.) রাহ. মসজিদে নেই- এমনটি ঘটত না।" -হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১৬৩; কিতাবুস সিকাত ইবনে হিব্বান ৪/২৭৪

ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন-

كَانَ الأَعْمَشُ قَرِيْباً مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبِيْرَةُ الأُوْلَى.

"প্রায় সত্তর বছর যাবৎ আ'মাশ রাহ. (১৪৮ হি.)-এর তাকবীরে উলা ছোটেনি।" -তারীখে বাগদাদ ১০/৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২২৮

ফিকহে হানাফীর বড় একজন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সামাআ রাহ. (২৩৩ হি.) বলেন-

مَكَثْتُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْنِي التَّكبِيرَةُ الأُوْلَى، إِلاَّ يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة.

"চল্লিশ বছর যাবৎ আমার তাকবীরে উলা ছোটেনি, একদিন ছাড়া; সেদিন আমার মায়ের ইন্তিকাল হয়। তাই এক ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে পারিনি।" -তারীখে বাগদাদ ৫/৩৪৩, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬৪৬

আবু হাইয়্যান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবী'ঈ ইবন খুসাইমকে পক্ষাঘাত (রোগ) অবস্থায় সালাতের জন্য (মসজিদে) নিয়ে আসা হত, তাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার জন্য বাড়ীতে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন আমি তো "হাইয়্যা 'আলাস সালাহ" শুনতে পাই, তোমাদের যদি সালাতে পৌঁছার সমর্থ থাকে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হও।"

ইবরাহীম আত-তাইমী রহ. বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তিকে সালাতের তাকবীরে উলায় (প্রথম) অংশ গ্রহণে অলসতা করতে দেখ তবে তার থেকে বিমূখ হয়ে যাও।"

মুস'আব বলেন, 'আমের মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলেন, আমার হাত ধর, (মসজিদে যাওয়ার জন্য) তাকে বলা হলো: আপনি তো অসুস্থ। তিনি

বললেন: আমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর সে আহ্বানে সাড়া দিব না? লোকেরা তার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি মাগরিব সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিলেন এবং এক রাকাত সালাত আদায় করার পর মারা যান, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। (এই ব্যক্তি হলেন আমের ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম)

মুহাম্মাদ ইবন মুবারক বলেন, "সা'ঈদ ইবন আব্দুল আযীযের সালাতের জামা'আত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন।"

গাস্সান বলেন, আমার নিকট আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা বিশর ইবন মানসুর বাসরীকে তাকবীরে উলা ছুটেছে দেখি নি।"

'আমের আবদে কায়েস আম্বারীকে বলা হলো: "আপনি কি সালাতে স্বীয় আত্মার সাথে কথা বলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আমার আত্মা সাথে আল্লাহর সম্মুখীন এবং স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে কথা বলি।"

'আলী ইবন হুসাইন ইবন যাইনুল আবেদীন যখন সালাতে দাঁড়াতেন তার কম্পন শুরু হয়ে যেত। যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: "তোমরা কি জান না যে, আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই এবং কথোপকথন করি"?

একবার তার বাড়ীতে আগুন লেগে যায় আর তিনি তখন সাজদারত ছিলেন। সাজদাহ থেকে তিনি যখন মাথা উঠান সে সময় আগুন নিভে গিয়েছিল, এ ব্যাপারে তাকে বলা হলে তিনি বলেন, "আমাকে অন্য আরেকটি আগুনে এই আগুন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল।"

মুসলিম ইবন ইয়াসার আল বাসারী যখন সালাত আদায় করতেন মনে হতো যেন একটি কাঠ দাঁড়ানো আছে। এদিক সেদিক ঝুকতেন না এবং যখন সালাত শুরু করতেন তার পরিবারকে বলতেন: "তোমরা কথপোকথন কর, কেননা আমি তোমাদের কথা শুনতে পাই না।"

আ'মাশ বলেন, "ইবরাহীম আত-তাইমী যখন সাজদাহ করতেন মনে হতো তিনি যেন কোনো দেওয়ালের অংশ এবং চড়ুই পাখী তাঁর পিঠে বসে যেত।"

আহমদ ইবনে সিনান বলেন, "আমি ওয়াকী'কে দেখেছি যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন সামান্যতমও নড়াচড়া করতেন না এবং উভয় পায়ে ভর না দিয়ে শুধু এক পায়ে ভর করে ঝুঁকে যেতেন না।"

ইয়া'কুব ইবন ইয়াযীদ বাসরীর একবার সালাতের অবস্থায় কাঁধ থেকে চাদর চুরি হয়ে যায় এবং তাকে এরপর ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সালাতে মগ্ন থাকার জন্য তিনি তা অনুভবও করতে পারেন নি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবন নাসর মারওয়াযীর চেয়ে উত্তম সালাত আদায়কারী অন্য কাউকে দেখি নি, তার কানে মাছি বসতো এবং রক্ত বয়ে যেত, কিন্তু তিনি মাছিকে সরাতেন না, অতঃপর তিনি বলেন, তিনি স্বীয় চিবুক (থুৎনি) বুকে রেখে এমনভাবে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন যে মনে হতো তিনি একটি স্থাপনকৃত কাঠ।"

নামাজের ব্যাপারে এমনই ছিলেন আমাদের সালাফে সালিহীন। নামাজের ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামে। তাই আমাদের জীবনেও নামাজের বিষয়ে এমন যত্ন ও গুরুত্ব থাকা উচিত।

নামজের ফজিলত

নামাজের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ.

"দিনের প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।" - সূরা হুদ (১১) : ১১৪

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামাজ বহু পাপ মিটিয়ে দেয়।

আরো ইরশাদ করেছেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

"এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।" -সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

অর্থাৎ নামাজ আদায় করতে থাকলে একসময় এই নামাজই মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

এছাড়া আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য নামাজকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

وَ اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلَی الْخٰشِعِیْنَ.

"তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় নামাজকে কঠিন মনে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ (অর্থাৎ বিনয় ও মনোযোগ)-এর সাথে আদায় করে।" - সূরা বাকারা (২) : ৪৫

এখানে ধৈর্য ও নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্যের দৃঢ় আশ্বাস পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করে, মনোযোগ সহকারে দুই রাকাত নামাজ পড়ে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”

(সহিহ বুখারী)

হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত,

“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে একবার বের হলেন। ঐ সময় গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছ থেকে দুটি ডাল নিয়ে সেগুলো নাড়া দিয়ে পাতা ফেলতে থাকেন এবং বললেন, আবু যর! আমি বললাম, লাববাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে তখন তার গুনাহগুলো এভাবে ঝরে যায় যেমন এই গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে। (মুসনাদে আহমদ ৫/১৭৯)

১.৩ইসলামে নামাজের স্থান ও মর্যাদা

ইসলামে রয়েছে নামাজের অনেক বড় মর্যাদা। অন্য কোন ইবাদত এই মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এটি প্রমাণ করে:

এক: নামাজ ইসলামের মূলস্তম্ভ; যা ছাড়া ইসলাম দণ্ডয়মান হতে পারে না।

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে,

“ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি কী তোমাকে ধর্মের মস্তক, মূলস্তম্ভ ও শীর্ষচূড়া সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম: অবশ্যই; হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন: ধর্মের মস্তক হলো ইসলাম। মূলস্তম্ভ হলো: নামাজ এবং শীর্ষচূড়া হলো জিহাদ...” ।[সুনানে তিরমিযি (২৬১৬), আলবানী ‘সহিহুত তিরমিযি’ গ্রন্থে (২১১০) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

দুই: দুই সাক্ষ্যবাণীর পরেই নামাজের স্থান; যাতে করে সেটি আকিদার শুদ্ধতা ও সঠিকতার প্রমাণ হয় এবং অন্তরে যা স্থান করে নিয়েছে ও সত্যায়ন করেছে সেটার দলিল হয়।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ্‌ ছাড়া) এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র দাস ও বার্তাবাহক) এই সাক্ষ্য দেয়া; নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।”[সহিহ বুখারী (৮) ও সহিহ মুসলিম (১৬)]

নামাজ কায়েম মানে: পরিপূর্ণভাবে সকল কথা ও কাজসহ নির্দিষ্ট সময়মত নামাজ আদায় করা; যেমনটি কুরআনে কারীমে এসেছে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় সময়মত নামাজ আদায় করা মুমিনদের উপর ফরযকৃত"।

তিন: নামাজ ফরয হওয়ার স্থানের কারণে অন্য সকল ইবাদতের উপর নামাযের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

এই নামাজের বিধান নিয়ে কোন ফেরেশতা পৃথিবীতে নাযিল হননি। কিন্তু আল্লাহ্ চেয়েছেন তাঁর রাসূলকে আসমানে ঊর্ধ্ব গমন করাতে এবং তিনিই সরাসরি নামাজের ফরযিয়তের বিষয়ে সম্বোধন করতে। এটি অন্যসব শরয়ী বিধান থেকে নামাজের বিশেষত্ব।

নামাজকে মেরাজের রাতে হিজরতের তিন বছর আগে ফরজ করা হয়েছে।

প্রথমে পঁঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করা হয়েছিল। পরে সেটাকে শিথিল করে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছে। তবে পঁশ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব বলবৎ আছে। এটি নামাজ আল্লাহ্র প্রিয় হওয়া এবং নামাজের মহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

চার: নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: বকরের হাদিসে এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি্ ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন: "যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নহর থাকে এবং সে এ নহর থেকে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে; তার গায়ে কী কোন ময়লা থাকবে; তোমাদের কী মনে হয়? সাহাবীরা বলল: কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন: এটাই হলো নামাজের উপমা। নামাজগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করেন।"[সহিহ বুখারী (৫২৮) ও সহিহ মুসলিম (৬৬৭)]

পাঁচ: দ্বীনের সর্বশেষ যে জিনিসটি হারিয়ে যাবে সেটি হলো নামাজ। যখন নামাজ হারিয়ে যাবে তখন গোটা দ্বীনই হারিয়ে যাবে...।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুমিন ব্যক্তি এবং শির্ক-কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হচ্ছে- নামাজ বর্জন।"[সহিহ মুসলিম (৮২)]

তাই একজন মুসলিমের উচিত যথাসময়ে নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। অলসতা না করা এবং ভুলে না-থাকা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "অতএব, দুর্ভোগ সেই নামাজীদের জন্য যারা তাদের নামাজ আদায়ের ব্যাপারে অমনোযোগী।"[সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫]

যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে তাকে ধমক দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "কিন্তু তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামাজ নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততা এর সম্মুখীন হবে।" [সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯]

ছয়: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে...।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে সেটা হচ্ছে- নামাজ। যদি নামাজ ঠিক থাকে তাহলে সে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হবে। আর যদি নামাজ ঠিক না থাকে তাহলে সে ব্যর্থ ও বিফল হবে। যদি তার ফরয নামাজে কিছু ঘাটতি থাকে; তখন রব্ব বলবেন: দেখ; আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? থাকলে সেটা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে তার বাকী আমলগুলোরও হিসাব নেয়া হবে।"[সুনানে তিরমিযি (৪১৩), সহিহুল জামে (২৫৭৩)]

নামাজ হচ্ছে মুমিনের মিরাজ। অর্থাৎ, এটি এমন এক ইবাদত যা মানুষকে আল্লাহর দরবারে উত্তীর্ণ করে। ফরজ নামাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত ইবাদত হিসেবে নফল নামাজ আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য অর্জনের বিশেষ মাধ্যম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবাসি।"(সহীহ বুখারী)

১.৪ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজের পার্থক্য

ইসলমে নামাজের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে — ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল। প্রতিটির মর্যাদা, বিধান ও আদায়ের গুরুত্ব আলাদা।

এই শ্রেণিবিভাগ খুব পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত আছে, যাতে মুসলমান বুঝতে পারে কোন নামাজ তার জন্য বাধ্যতামূলক, আর কোনটি অতিরিক্ত সওয়াবের জন্য।

১। ফরজ নামাজ:

অর্থ ও সংজ্ঞা:

ফরজ মানে এমন ইবাদত যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল ﷺ স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে আদেশ করেছেন।

ফরজ নামাজ আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

ফরজ নামাজের ধরন:

ফরজে আইন: প্রত্যেক মুসলমানের ওপর বাধ্যতামূলক। যেমন: ৫ ওয়াক্ত নামাজ।

ফরজে কিফায়া: সমাজের কিছু লোক আদায় করলে বাকিদের দায়িত্ব মাফ। যেমন: জানাজার নামাজ।

হুকুম: ফরজ নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে মানুষ গুনাহগার ও ফাসিক হয়।
ফরজ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় (কারণ এটি ঈমানের মূল অংশ)।

২।ওয়াজিব নামাজ :

অর্থ ও সংজ্ঞা:

ওয়াজিব মানে এমন ইবাদত যা আল্লাহ বা রাসুল ﷺ আদেশ করেছেন অবশ্য পালনীয়।ওয়াজিবও ফরজের মতোই বাধ্যতামূলক।

উদাহরণ:বিতরের নামাজ, ঈদের দুই নামাজ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।

হুকুম:ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ত্যাগ করা গুনাহের কাজ, তবে ফরজ অস্বীকার করার মতো কাফের হয় না।ওয়াজিব নামাজ আদায় করলে বেশি সওয়াব, না করলে গুনাহ।

৩।সুন্নাত নামাজ:

অর্থ ও সংজ্ঞা:

সুন্নাত মানে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে যা করেছেন এবং মুসলমানদের তা করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

সুন্নাতের ধরন:

(ক) সুন্নাতে মুআক্কাদা (নিয়মিত সুন্নাত)

যা নবী ﷺ সবসময় আদায় করেছেন এবং কদাচিৎ ত্যাগ করেছেন।

হুকুম:এটি ছেড়ে দেওয়া অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ও গুনাহের আশঙ্কা আছে।

উদাহরণ:
ফজরের আগে ২ রাকাআত, যোহরের আগে ৪ ও পরে ২, মাগরিবের পরে ২, এশার পরে ২ রাকাআত।

(খ) সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা (অ-নিয়মিত সুন্নাত)

যা নবী ﷺ মাঝে মাঝে পড়েছেন কিন্তু সবসময় নয়।

হুকুম:আদায় করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ নেই।

উদাহরণ:
আসর বা ইশার আগে ৪ রাকাআত, যোহরের পরে অতিরিক্ত ২ রাকাআত।

৪ নফল নামাজ:

অর্থ ও সংজ্ঞা:

নফল অর্থ অতিরিক্ত ইবাদত — অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের ইচ্ছায় পড়া নামাজ। এটি ফরজ বা ওয়াজিব নয়, তবে এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে আরও নিকট হয়।

হুকুম:আদায় করলে অত্যন্ত সওয়াব।না পড়লে কোনো গুনাহ নেই।
উদাহরণ:তাহাজ্জুদ,ইশরাক, চাশত ইত্যাদি।

নামাজের এই শ্রেণিবিন্যাস ইসলামী জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ বান্দার জন্য কর্তব্য, সুন্নাত নামাজ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণের প্রতীক, আর নফল নামাজ আল্লাহর ভালোবাসা ও অতিরিক্ত সওয়াব অর্জনের সোপান। একজন মুমিনের উচিত সব স্তরের নামাজকে গুরুত্ব দেওয়া — কারণ এগুলো মিলেই একজন মুসলমানের ইমান, চরিত্র ও আত্মিক উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয়।

অধ্যায় ২: নফল নামাজের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

২.১ নফল নামাজের অর্থ ও শাব্দিক বিশ্লেষণ

‘নফল’ শব্দটি আরবি মূল শব্দ “نَفْل” (নাফল) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ অতিরিক্ত, বাড়তি বা স্বেচ্ছাকৃত কিছু। অর্থাৎ, নফল নামাজ এমন নামাজ যা ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং বান্দা স্বেচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আদায় করে থাকে।

এটি ফরজ নামাজের পরিপূরক ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়, যা একজন মুসলমানকে আল্লাহর নিকট আরও প্রিয় ও সম্মানিত করে তোলে।

২.২ ইসলামী পরিভাষায় নফল নামাজের সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়তের ভাষায়,

নফল নামাজ হলো এমন ইবাদত যা ফরজ বা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আদায় করা হয়।

যে আমল রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত করতেন এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন তাকে মুস্তাহাব, নফল বা মানদুব বলা হয়।

এই নামাজের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আত্মিক শান্তি অর্জন, এবং নিজের আমলকে আরও উন্নত করা।এমন বিধানের ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। এর ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না।

২.৩ নফল নামাজের প্রকারভেদ

নফল নামাজের অনেক ধরন রয়েছে। নিচে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত নফল, নামাজগুলোর নাম ও ফজিলত দেওয়া হলো—

(১)তাহাজ্জুদ:

তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ হলো ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা বা রাতে জেগে ইবাদত করা।

তাহাজ্জুদ নামাজ হলো এক ধরনের নফল নামাজ, যা রাতের শেষাংশে, ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়।

ইসলামি পরিভাষায় (শরিয়তের দৃষ্টিতে):
রাতে ঘুমানোর পর জেগে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে নামাজ আদায় করা হয়, তাকেই তাহাজ্জুদ নামাজ বলা হয়।

রাকাআত:তাহাজ্জুদ নামাজ কমপক্ষে ২ রাকআত এবং সাধারণভাবে ৮ রাকআত পর্যন্ত পড়া সুন্নাতে মুস্তাহাব (অত্যন্ত প্রশংসনীয়)।
তবে ইচ্ছা করলে ১০ বা ১২ রাকআত পর্যন্ত পড়া জায়েজ ।

নবী ﷺ এর তাহাজ্জুদ নামাজের রাকআত সংখ্যা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت:

"مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً".

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান বা রমযানের বাইরে কখনোই ১১ রাকআতের বেশি নামাজ পড়তেন না।"
— সহিহ বুখারি, হাদীস: ১১৪৭; সহিহ মুসলিম, হাদীস: ৭৩৮
ব্যাখ্যা:
এখানে ১১ রাকআতের মধ্যে ৮ রাকআত তাহাজ্জুদ ও ৩ রাকআত বিতর নামাজ অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ, নবী ﷺ সাধারণত ৮ রাকআত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন।

আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে চার রাকাত (তাহাজ্জুদ) ও তিন রাকাত (বিতির), ছয় রাকাত (তাহাজ্জুদ) ও তিন রাকাত (বিতির), আট রাকাত (তাহাজ্জুদ) ও তিন রাকাত (বিতির), দশ রাকাত (তাহাজ্জুদ) ও তিন রাকাত (বিতির) পড়তেন। তিনি (তাহাজ্জুদ ও বিতির মিলে) সাত রাকাতের কম এবং তেরো রাকাতের বেশি পড়তেন না।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস **১৩৬২**

এ থেকে জানা গেল, নবীজী চার রাকাতের কম তাহাজ্জুদ পড়তেন না। আয়েশা রা. অন্য বর্ণনায় বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ سِنًّا وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজ্জুদ ও বিতির মিলে) নয় রাকাত পড়তেন। এরপর যখন তাঁর বয়স বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যগতভাবে একটু ভারী হয়ে যান তখন (তাহাজ্জুদ ও বিতির মিলে) সাত রাকাত পড়তেন।” -শরহু মাআনিল আছার, হাদীস **১৬৯১**

এ থেকে জানা গেল, নবীজী জীবনের শেষ দিকে চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন।

তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব:

তাহাজ্জুদ নামাজ ইসলামের একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এটি এমন একটি নামাজ যা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ উপহার হিসেবে রেখেছেন।
এ নামাজ আদায় করলে আল্লাহর নিকট বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ মাফের দরজা খুলে যায়।

আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“আর রাত্রির কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। এতে করে আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত অবস্থায় কিয়ামতের দিনে উঠাবেন।” — সূরা আল-ইসরা: ৭৯

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রে যখন রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন প্রথম আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে যে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে যে, আমি তাকে দিব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?”[বুখারী ১১৪৫; মুসলিম৭৫৮]

এর দ্বারা শেষ রাত্রির ইবাদতের গুরুত্ব বোঝা যায়। এ সময়কার দোআ কবুল হয়। এটা মূলত তাহার্জ্জুদের সময়।

তাহাজ্জুদের ফযীলত
তাহাজ্জুদ মহিমান্বিত একটি ইবাদত। কুরআন ও হাদীসে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং এর প্রতি খুব উৎসাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ، اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ، كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ، وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

“নিশ্চয় মুত্তাকীগণ উদ্যানরাজি ও ঝরনাসমূহের ভেতর থাকবে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল। তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত।” -সূরা যারিয়াত (৫১) : ১৫-১৮

এখানে মুত্তাকীদের জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা দুনিয়াতে সৎকর্মশীল ছিল। তারপর তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রাতে খুব অল্প সময় ঘুমাত। রাতের বেশির ভাগ সময় তারা আল্লাহর ইবাদতে কাটাত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, সাহরীর সময়, যখন রাত শেষ হয়ে আসত, তখন তারা নিজেদের ভুলত্রুটির জন্য কাকুতি-মিনতির সঙ্গে ইস্তিগফার করত।
এ থেকে বোঝা যায়, রাতের ইবাদত আল্লাহর কাছে খুব পছন্দনীয় এবং শেষ রজনী অনেক বরকতপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا، نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا، اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا، اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا، اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا.

“হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রি জাগরণ করুন, তবে কিছু সময় ছাড়া। অর্ধেক রাত বা তা থেকে কিছুটা কমান কিংবা তা থেকে বাড়িয়ে নিন এবং ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন। আমি আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করছি। নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ (প্রবৃত্তির) দলনে অধিকতর কঠোর এবং বাক্য উচ্চারণে অধিকতর সঠিক।”-সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ১-৬

এখানে নবীজীকে অর্ধেক রাত বা তার থেকে কিছু কমবেশি সময় তাহাজ্জুদ পড়ার আদেশ করা হয়েছে এবং তাতে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن.َ

“তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা তাদের রবকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি জানে না- এরূপ লোকদের জন্য তাদের কর্মফলস্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” -সূরা সাজদা (৩২) : ১৬-১৭

এখানে ওই মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা রাতের বেলা মধুর নিদ্রা ও সুখশয্যা ত্যাগ করে আল্লাহর আযাবের ভয় ও রহমতের আশা নিয়ে তাঁকে ডাকে, নামায পড়ে।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

“এবং যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের সামনে (কখনো) সেজদাবনত অবস্থায় এবং (কখনো) দণ্ডায়মান অবস্থায়।” -সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৪

এখানে আল্লাহ ‘ইবাদুর রহমানের’ (তাঁর ওই বান্দাদের) প্রশংসা করেছেন, যারা রাতের বেলায় নিদ্রা ও আরামের স্বাদ বিসর্জন দিয়ে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান থাকে, সিজদাবনত হয়, নামাযে মগ্ন থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَنْزِلُ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه.ُ

“আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ, আমার কাছে দুআ করবে, আমি তার দুআ কবুল করব। কে আছ, আমার

কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮
লক্ষ করুন, শেষ রজনী কত বরকতপূর্ণ যে, এ সময় খোদ আল্লাহ বান্দাকে ডাকতে থাকেন। কীভাবে ডাকেন তাও আমরা জানলাম। মহান আল্লাহর এমন আহ্বানের পরও বান্দার জন্য ঘুমে বিভোর থাকা বড় আফসোসের বিষয়।

অন্য হাদীসে নবীজী পরিষ্কার বলেন-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السّاعَةِ فَكُن.ْ

"রব বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষ ভাগে। যদি পার ওই সময় আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও!" -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১১৪৭

নবীজী আরো বলেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللّيْلِ.ِ

"রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামাজ রাতের নামাজ।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

الصّلاَة فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ.ِ
গভীর রাতে নামাযজ পড়া। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৩৪

অন্য হাদীসে বলেন-

يَاأَيّهَا النّاسُ، أَفْشُوا السّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ، وَصَلّوا وَالنّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِسَلاَمٍ.ِ

“হে লোক সকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার করাও! আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজ আদায় কর! তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৮৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৩৭৮৪

একবার নবীজী মুআয রা.-কে বলেন-

أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হল-

১. রোযা ঢালস্বরূপ।

২. সদকা গোনাহ এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়।

৩. গভীর রাতের নামাজ।

এরপর নবীজী সূরা সাজদার ১৬-১৭ নং আয়াত পাঠ করেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬

রাতের সালাত আদায় কারীদের জন্য জান্নাতের উঁচু প্রসাদসমূহ তৈরী করা হয়েছে। আবু মালেক আশা'আরী রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

নিশ্চয়ই জান্নাতে কতক বলখানা রয়েছে, যার বাহির ভেতর থেকে ও ভেতর বাহির থেকে দেখা যাবে।যা আল্লাহ তৈরী করেছেন তাদের জন্য যারা খাদ্যদান করে, বিনয়াবনত কথা বলে, সিয়ামের পর সিয়াম পালন করে,সালামের প্রসার করে রাতে সালাত আদায় করে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে।

তাহাজ্জুদের প্রতি নবীজীর ভালোবাসা ও আগ্রহ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেও আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত বিষয়াদি সবিস্তার আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তিকার দরকার। এখানে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা পেশ করা হল।

তাহাজ্জুদের প্রতি নবীজীর অপরিসীম আগ্রহ ও ভালবাসা ছিল। তিনি সারা বছর সীমাহীন গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে তাহাজ্জুদ পড়তেন। বিনা ওজরে কখনো তা তরক করেননি। তিনি এশার নামাজের পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। শোয়ার সময় বিভিন্ন দুআ-তাসবীহ পড়তেন।

প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিয়ে দ্রুত উঠে যেতেন। ওঠার পরও দুআ-তাসবীহ পড়তেন। তারপর ওযু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দীর্ঘ সময় নামাজে মশগুল থাকতেন।
তিনি সাধারণত দুই দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। কখনো কখনো দশ বা ছয় অথবা চার রাকাতও পড়েছেন। তাতে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন। ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করতেন। রুকু-সিজদাও দীর্ঘ করতেন। তাহাজ্জুদ শেষে তিন রাকাত বিতির পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী কায়স রাহ. থেকে বর্ণিত, আয়েশা রা. তাঁকে বলেছেন-

لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَدَعُه، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّى قَاعِدًا.

“তুমি কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৭; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১১৩৭

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. আরো বলেন-

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِه، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“যদি অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজরের দরুণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজ(তাহাজ্জুদ) আদায় করতে না পারতেন, তাহলে দিনের বেলায় বারো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন।” -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬

এ দুই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তাহাজ্জুদের প্রতি নবীজীর কত গুরুত্ব ছিল।

আয়েশা রা. আরো বলেন-

كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তেরো রাকাত নামায পড়তেন। তারপর দুই রাকাত কমিয়ে এগারো রাকাত পড়তেন। মৃত্যুর আগের সময়গুলোতে নয় রাকাত পড়তেন। তাঁর রাতের সর্বশেষ নামাজ ছিল বিতির।” -সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১১৬৮

এই বর্ণনায় উল্লেখিত নামাজ থেকে বিতির বাদ দিলে বাকি থাকে যথাক্রমে দশ, আট ও ছয় রাকাত। তার অর্থ নবীজী যথাক্রমে দশ রাকাত, আট রাকাত, ছয় রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রাহ. আয়েশা রা.-কে নবীজীর রমযানের রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ও রমযানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি (তাহাজ্জুদ) পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি জানতে চেয়ো না। তারপর চার রাকাত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কেও জানতে চেয়ো না। এরপর তিন রাকাত (বিতির) পড়তেন।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৪৭

এ থেকে বোঝা যায়, নবীজী রমযানে ও রমযানের বাইরে সাধারণত আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং তাঁর নামায এত দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রা. বলেন-

قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً.ً

“একবার রাতের বেলায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাকারা পড়লেন। রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করলে আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করতেন। আর আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করলে তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এরপর কিয়াম সমপরিমাণ রুকু করেন। তারপর কিয়াম সমপরিমাণ সিজদা করেন। তারপর (দ্বিতীয় রাকাতে) দাঁড়িয়ে সূরা আলে ইমরান পড়েন। পরে এক একটি সূরা পড়েন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৭৩

এ থেকে অনুমেয়, নবীজী তাহাজ্জুদের নামাযে কিয়াম, রুকু ও সিজদা কত দীর্ঘ করতেন এবং কত চিন্তাভাবনা ও ধ্যানমগ্নতার সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব পড়ত।”

তাহাজ্জুদের প্রতি সালাফের ভালোবাসা ও আগ্রহ

নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল তাহাজ্জুদগুজারের সরদার। সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাজ্জুদগুজার। তাঁর তাহাজ্জুদ-প্রীতির সুন্দর প্রভাব পড়েছে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের ওপর। তাঁরা তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তাহাজ্জুদের সঙ্গে তাঁদের অন্তরের সম্পর্ক ছিল। ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। তাঁরা গভীর রাতে সুখশয্যা ত্যাগ করে প্রভুর ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। তাহাজ্জুদ পড়তেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন, দুআ-যিকির করতেন, তওবা-ইস্তিগফার করতেন। হাদীস, সীরাত ও তারীখের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্ময়কর প্রচুর ঘটনা রয়েছে।

১. আসলাম রাহ. বলেন-

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُمُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

“উমর রা. রাতের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছায় যতটুকু সম্ভব নামায পড়তেন। এরপর রাতের শেষ ভাগে পরিবারবর্গকে ‘নামাজ, নামাজ’ বলে জাগিয়ে দিতেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন-

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

এবং নিজ পরিবারকে নামাজের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।" (সূরা ত্বহা : ১৩২) -মুআত্তা মালেক, বর্ণনা ৩১১

২. আলকামা রাহ. বলেন-

بِتُّ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةً، فَقَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَكَانَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، يُرَتِّلُ، وَلَا يُرَجِّعُ، يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَلَسِ إِلَّا كَمَا بَيْنَ الْأَذَانِ لِلْمَغْرِبِ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا، ثُمَّ أَوْتَرَ.

"একবার আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সঙ্গে রাত্রিযাপন করলাম। তিনি রাতের প্রথম ভাগে ঘুম থেকে উঠে নামাজ শুরু করেন। তাঁর মহল্লার মসজিদের ইমামের মতো তারতীলের সঙ্গে মধ্যম আওয়াজে তিলাওয়াত করেন। মাগরিবের আযান থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত যতটুকু অন্ধকার থাকে রাত ততটুকু অন্ধকার থাকা পর্যন্ত তিনি নামাজে মশগুল থাকেন। এরপর বিতির আদায় করেন।" -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ৯/২৮০, বর্ণনা ৯৪০৪

৩. আবু উসমান নাহদী রাহ. বলেন-

تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُه يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا، يُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَيُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا.

"আমি আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে সাত দিন মেহমানস্বরূপ ছিলাম। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ও খাদেম রাতকে তিন ভাগ করেছিলেন। একজন নামাজ পড়ে আরেকজনকে নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন।"-মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ৮৬৩৩

৪. একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী হাফসা রা.-এর কাছে তার ছোট ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বলেন, আবদুল্লাহ কতই না উত্তম মানুষ, যদি সে রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়ত।

হাফসা রা. বলেন-

فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

“এ কথা শোনার পর থেকে সে রাতে খুব অল্প সময়ই ঘুমাত।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১২২

৫. আবদুল্লাহ ইবনে শাউযাব রাহ. বলেন-

كَانَ عُرْوَةُ يَقْرَأُ رُبُعَ الْقُرْآنِ كُلَّ يَوْمٍ نَظَرًا فِي الْمُصْحَفِ، وَيَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ، فَمَا تَرَكَهُ إِلَّا لَيْلَةَ قُطِعَتْ رِجْلُه، ثم عاوده مِنَ اللَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ.

“উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রতিদিন কুরআনের এক চতুর্থাংশ দেখে তিলাওয়াত করতেন এবং তাহাজ্জুদেও সেটাই পড়তেন। যেদিন তার পা কাটা হয় কেবল সে দিনই তিনি তা পড়তে পারেননি। পরদিন থেকে আবার শুরু করেন।” -আলমারিফাতু ওয়াততারীখ ১/৫৫২

৬. আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা রাহ. বলেন-

كان زبيد اليامي يجزئ الليل ثلاثة أجزاء، جزءا عليه، وجزءا على عبد الرحمن ابْنه، وجزءا على عَبد الله ابنه، وكان زبيد يصلي ثلث الليل ثم يقول لأحدهما: قم، فإن تكاسل صلى جزئه، ثم يقول للآخر: قم، فإن تكاسل صلى جزئه، فيصلي الليل كله.

“যুবায়দ (ইবনে হারিস) ইয়ামী রাতকে তিন ভাগ করেছিলেন। এক ভাগ নিজের জিম্মায়, আরেক ভাগ পুত্র আবদুল্লাহর জিম্মায়, আরেক ভাগ অপর পুত্র আবদুর রহমানের জিম্মায়। তিনি এক তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়তেন। তারপর এক ছেলেকে উঠতে বলতেন। সে অলসতা করলে তার অংশে নিজেই নামাজ পড়তেন। তারপর অন্য ছেলেকে উঠতে বলতেন। সে অলসতা করলে তার অংশেও নিজেই নামাজ পড়তেন। এভাবে কখনো কখনো পুরো রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন।” -আলমুযাক্কিয়াত, পৃ. ২৫২

৭. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির রাহ. বলেন, আমরা আতা ইবনে আবী মুসলিমের সঙ্গে জিহাদে ছিলাম। তিনি পুরো রাত নামাজ পড়তেন। তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক রাত পার হলে তিনি আমাদের ডাকতেন আর বলতেন-

قُومُوا وَتَوَضَّئُوا وَصَلُّوا، فَإِنَّ قِيَامَ هَذَا اللَّيْلِ وَصِيَامَ هَذَا النَّهَارِ أَيْسَرُ مِنْ شَرَابِ الصَّدِيدِ وَمُقَطَّعَاتِ الْحَدِيدِ، الْوَحَا الْوَحَا، النَّجَا النَّجَا، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِه.

“তোমরা ওঠ, ওযু কর, নামায পড়। এই রাতে ওঠা, দিনে রোযা রাখা পুঁজ পান করা ও হাতুড়িপেটা অপেক্ষা সহজ। জলদি কর, মুক্তি খোঁজো। এরপর তিনি নিজ নামাজে মনোনিবেশ করতেন।” -হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১৯৩

৮. ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন-

كَانَ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ ابْنَا صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ وَأُمُّهُمَا قَدْ جَزَّءُوا اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُومُ الثُّلُثَ ثُمَّ يَنَامُ، وَيَقُومُ الْحَسَنُ الثُّلُثَ ثُمَّ يَنَامُ، وَتَقُومُ أُمُّهُمُ الثُّلُثَ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُمَا، فَجَزَّأَ اللَّيْلَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَا يَقُومَانِ بِهِ حَتَّى الصَّبَاحَ، ثُمَّ مَاتَ عَلِيٌّ، فَقَامَ الْحَسَنُ بِهِ كُلِّهِ.

“সালেহ ইবনে হুয়াইয়ের দুই পুত্র আলী, হাসান ও তাদের মা রাতকে তিন ভাগ করেছিলেন। আলী এক তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়ে বিশ্রাম করতেন। তারপর হাসান এক তৃতীয়াংশ নামাজ পড়ে বিশ্রাম করতেন। এরপর তাদের মা এক তৃতীয়াংশ রাত নামাজ পড়তেন। মায়ের মৃত্যুর পরে দুই ভাই রাতকে দুই ভাগ করে নামাজ পড়তেন। আলী ইন্তেকাল করলে হাসান একাই পুরো রাত্রি জাগরণ করতেন।” -হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩২৭

৯. হুসাইন ইবনে আলী কারাবিসী রাহ. বলেন-

بت مع الشافعي غير ليلة، فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر فمائة، وكان لا يمر بآية
رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ منها، وسأل النجاة لنفسه ولجميع المسلمين.

“আমি শাফেয়ী রাহ.-এর সঙ্গে একাধিক রাত থেকেছি। তিনি প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়তেন। পঞ্চাশ থেকে সর্বোচ্চ একশ আয়াত পড়তেন। রহমতের আয়াত এলে নিজের জন্য এবং সকল মুমিন-মুসলমানের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করতেন। আর আযাবের আয়াত এলে নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।” -তারীখে বাগদাদ ২/৩৯২

তাহাজ্জুদের প্রতি আকাবিরে দেওবন্দের ভালোবাসা ও আগ্রহ

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের মতো প্রতি যুগের আল্লাহ-প্রেমীরা তাহাজ্জুদের প্রতি আগ্রহী ও যত্নবান ছিলেন। আমাদের আকাবিরগণ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

১. মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী রাহ. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. (১৩২৩ হি.) সম্পর্কে লেখেন, তিনি এশার নামাযের পর ওযীফা থেকে ফারেগ হয়ে বিশ্রাম করতেন। প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাত বাকি থাকতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতেন।
...জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর ছাহেব নানূতবী বলতেন, একবার হজ্বের সফরে আমি হযরতের সঙ্গে ছিলাম। এক রাতে জাহাজে তাহাজ্জুদের সময় হযরতের গোসলের প্রয়োজন হলে আমাকে বলেন, সমুদ্র থেকে কিছু পানি তুলে দাও, আমি গোসল করব। আমি আরয করলাম, এখনো অনেক রাত বাকি; সকাল হোক। একদিন তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি এটা মঞ্জুর করলেন না। তিনি ওই সময়ই গোসল করে তাহাজ্জুদ আদায় করেন এবং যথানিয়মে ওযীফা ও তিলাওয়াতে মশগুল হন। -তাযকিরাতুর রশীদ ২/২১-২২

২. মিরাঠী রাহ. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ. (১৩৪৬ হি.) সম্পর্কে বলেন, হযরতের আমল ছিল শেষ রাতে দশ বা বারো রাকাত তাহাজ্জুদ পড়া। এতে তিনি প্রায় দুই পারা তিলাওয়াত করতেন। -তাযকিরাতুল খলীল, পৃ. ৩০৬

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তফা বিজনূরী হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১৩৬২ হি.) সম্পর্কে লেখেন, তিনি অর্ধরাতের পরে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন। অধিকাংশ সময় রাতের শেষ ষষ্ঠাংশে উঠতেন। কখনো এর আগপিছ হত। সাধারণত আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। কখনো কমবেশি হত। রমযান মাসে তাহাজ্জুদে দৈনিক এক পারা তিলাওয়াত করতে দেখেছি। কখনো এর চেয়ে বেশিও দেখেছি। -মামূলাতে আশরাফী পৃ. ২০

(২) ইশরাক নামাজ

ইশরাক শব্দের অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয়।

ফরজ নামাজের পর সেই স্থানেই বসে জিকির, দুআ, দরূদ, ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবী কোন কথা না বলা। এভাবে যখন সূর্য উদিত হয়ে যায়। এর দশ বারো মিনিট পর দুই/চার রাকাআত নামাজ আদায় করা হয়। সেই নামাজকে ইশরাকের নামাজ বলা হয়। তবে ফরজ নামাজের পড়ে দুনিয়াবি কাজে মগ্ন হয়ে থাকলে সূর্য উদিত হবার পর ইশরাক পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে।

সময়:সূর্যোদয়ের প্রায় ১০–১৫ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের ৫ মিনিট আগ পর্যন্ত সময়। তবে উত্তম হলো, সূর্যোদয়ের এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ইশরাক পড়া ।

রাকাআত: ন্যূনতম ২ রাকাআত, সর্বোত্তম ৪ বা ৮ রাকাআত।

ফজিলত:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা’আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা’আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক’আত নামায আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।

-হাসান। তা’লীকুর রাগীব- (১/১৬৪, ১৬৫), মিশকাত- (৯৭১)
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৫৮৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
‘যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ল। অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর জিকির করল; অতঃপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ল; সে একটি হজ ও ওমরাহ করার সাওয়াব নিয়ে ফিরে গেল।’ (তাবারানি, আত-তারগিব)
অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘সূর্য উঠার আগে আল্লাহর জিকির, তাকবির, তাহমিদ ও তাহলিল পাঠ করা আমার কাছে ইসমাঈল বংশের দুইজন গোলাম আজাদ করার চেয়েও অধিক প্রিয়।’ (মুসনাদে আহামদ)
হজরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক নামাজের পর (ধারাবাহিক) আর এক নামাজ; যার মাঝখানে কোনো গোনাহ হয়নি, তা ইল্লিয়্যুন (উচ্চ মর্যাদায়) লেখা হয়।’ (আবু দাউদ)

হযরত হাসান বিন আলী রাাঃ থেকে বর্ণিত,
আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে,যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে,তারপর আল্লাহর যিকির করতে থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। তারপর ২ বা ৪ রাকাআত নামাজ আদায় করে। তাহলে জাহান্নামের তার চামড়া স্পর্শ করবে না।(শুয়াবুল ইমান লিলবায়হাকি ৩৬৭১)

(৩) চাশত নামাজ (দোহা নামাজ):

সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠার পর যে নামাজ আাদায় করা হয় তাকেই সালাতুদ্দুহা বলে। **রাকাআত:**এর কোন নির্দিষ্ট রাআত সংখ্যা নেই। চাশতের সালাত দুই, চার, ছয়, আট বা বারো রাআত পর্যন্ত পড়া যায়।
ইব্নু আবূ লায়লা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ
উম্মু হানী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সলাতুয্ যুহা (পূর্বাহ্নের সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানান নি। তিনি [উম্মু হানী (রাঃ)] বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাক’আত সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর চেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি রুকূ’ ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন।[সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১১০৩]

ফজিলত:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"প্রত্যেক দিন সকালে তোমাদের (মানব দেহের) গ্রন্থিগুলোর জন্য সদাকাহ রয়েছে (এ সদাকাহ প্রদান তোমাদের উপর দায়িত্ব)। একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা ১টি সদাকাহ, একবার 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদাকাহ, একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ১টি সদাকাহ, একবার আল্লাহু আকবার' বলা ১টি সদাকাহ, ভালো কাজে একবার আদেশ দেওয়া ১টি সদাকাহ, মন্দ কাজে নিষেধ করা ১টি সদাকাহ, আর এগুলোর মোকাবেলায় দু'রাকআত চাশতের সালাত আদায় করা আমাদের গ্রন্থিগুলোর সদাকাহ হিসেবে যথেষ্ট।" (মুসলিম, সলাতুল মুমিন- ১/৩৪২)।

তিনি আরো বলেন,

মানুষের শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি (বা জোড়া) রয়েছে। আর এ প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাকাহ করা আবশ্যক। লোকজন বলে উঠল, হে আল্লাহর নবী! এতগুলো সদাকাহ করার ক্ষমতা কি কেউ রাখে? উত্তরে তিনি বললেন, মসজিদ থেকে কফ-কাসি (নোংড়া জিনিস) দূর করে পূতে ফেলা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা (হলো সদাকাহ)। আর যদি তাও না পার তাহলে দু'রাকআত চাশতের সালাত আদায় কর। আর এটাই হবে এ গ্রন্থি (বা জোড়াগুলোর) সদাকাহ।"(আবু দাউদ: ৫২৪২)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

"হে বনী আদম! দিনের শুরুতে চার রাকআত চাশতের সালাত আদায় করার ইবাদতটি বাদ দিও না। (এটি আমল করলে) আখিরাতে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।(আবু দাউদ: ১২৮৯, তিরমিযী: ৪৭৫)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হল) ১. প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা। ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর সালাত আদায় করা)। ৩. বিত্‌র (সালাত) আদায় করে শয়ন করা।সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১১৭৮

(৪) আওয়াবীন নামাজ

মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাতের নামাজের পর এশার নামাজের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত যে নামাজ পড়া হয় তাকেই আওয়াবীনের নামজ বলে।

ফজিলত:

হাদিসে এই ছয় রাকাত আওয়াবীনের ফযিলতের ১২ বছরের ইবাদত করার সওয়াব অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।এছাড়াও আরো ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।
এ নামাযটির ব্যাপারে হাদিস

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ " مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً. "

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর ছয় রাকআত নফল সালাত (নামায/নামাজ) পড়লো এবং তার মাঝখানে কোন মন্দ কথা বলেনি, তাকে বারো বছরের ইবাদাতের সম-পরিমাণ সওয়াব দান করা হলো। (ইবনে মাজা ১১৬৭, তিরমিজি ৯৮ নং পৃষ্ঠা)
হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাঃ থেকে বর্ণিত রাসুল সাঃ বলেন যে ব্যাক্তি মাগরীবের পর ৬ রাকাত আওয়াবীনের নামাজ পড়বে,তাহলে তার গুনাহ সমুহ মাফ করে দেওয়া হবে,যদিও তার গুনাহ সাগরের ফেনা সমপরিমাণ হয়।
(ইবনে মাজা ৮১ পৃষ্ঠা)
হযরত হুযাইফা (রা) বলেন “আমি নবীজি (সা)-র কাছে এসে তার সাথে মাগরীবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরীবের পরে ইশার সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।”[সহীহ ইবনে খুজাইমা ১১৯৪]

হযরত আয়শা রদিআল্লহু আনহা থেকে বর্ণিত,
“রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাআত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।”
তিরমিজি, মিশকাত পৃ.১০৪

(৫) সালাতুত তাওবা (তওবার নামাজ)

সালাতুত তাওবা অর্থাৎ তাওবার নামাজ — এটি এমন একটি নফল নামাজ, যা কোনো মুসলমান নিজের গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে তাওবা করার সময় আদায় করে।

ফজিলত :

আবুবকর (রা.)-র বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কেউ যদি কখনো কোন গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর (প্রয়োজনে গোসল শেষে) উত্তমরূপে ওযূ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করে তার পাপের জন্য তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰي مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

“তারা- যখন কোন অশ্লীল কাজ করে বসে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের উপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আসলে) আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? এরা জেনে বুঝে কখনো নিজেদের গুনাহের ওপর অটল থাকে না।” (সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৩৫; আবু দাউদ: ১৫২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“কোনো এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর বলল: হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা’আলা বললেন, আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বলল: হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তা’আলা বললেন: আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বলল: হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা’আলা বললে, আমার বান্দা

গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন।" [বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ২৭৫৮]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে আবু বকর হাদীস শুনিয়েছে। আর আবু বকর সত্য বলেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কোনো লোক যদি গুনাহ করে, তারপর পাক-পবিত্র হয় এবং সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তিনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।" [তিরমিযী ৪০৬; ইবন মাজাহ ১৩৯৫; আবু দাউদ ১৫২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,
"তোমরা দয়া কর, তোমাদেরকেও দয়া করা হবে, তোমরা ক্ষমা করে দাও আল্লাহও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা কোনো কথা না শোনার জন্য নিজেদেরকে বন্ধ করে নিয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অন্যায় করার পর জেনে-বুঝে বারবার করে তাদের জন্যও ধ্বংস।" [মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৫]

(৬) সালাতুল হাযত(প্রয়োজনের নামাজ):

প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যে সালাত আদায় করতে হয় সেটাকে বলা হয় সলাতুল হাযত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদার বান্দারা! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) তোমরা সাহায্য চাও।" (সূরা ২; বাকারা ১৫৩)

সময়: যেকোনো প্রয়োজন বা কষ্টের সময়ে।

রাকাআত: ২।

ফজিলত:

সাহাবী আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য ওযু করে এবং ওযূটি উত্তমরূপে করে, তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করে (হামদ ও দুরূদ পাঠ করে) নিমের দু'আটি পড়বে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ বা অভাব পূরণ করে দেবেন হোক তা দ্রুত বা বিলম্বে (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যাকিছু চাইবে তাই কবুল হবে ইনশা আল্লাহ। দু'আটি হলো,

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই যিনি ধৈর্যশীল উদার। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই আল্লাহর যিনি মহা আরশের মালিক! আর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আমি তোমার কাছে তা চাচ্ছি, যা তোমার রহমতকে অপরিহার্য করে এবং তোমার ক্ষমাকে অবধারিত করে। আর প্রত্যেক পূণ্য থেকে উপকার পাবার এবং প্রত্যেক পাপ থেকে নিরাপদে থাকার কামনা করছি। তাই তুমি আমার কোন অন্যায়কে ক্ষমা না করে রেখে দিও না এবং কোন দুশ্চিন্তাকে দূর না করে রেখে দিও না। আর এমন কোন প্রয়োজন যাতে তোমার রেজামন্দি আছে তাকে পূরণ না করে রেখে দিও না, হে দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃ. ১১৭)।

(৭) সালাতুল ইস্তেখারা (সিদ্ধান্ত নেওয়ার নামাজ)

ইসতিখারা শব্দের অর্থ হল, খাইর বা কল্যাণ প্রার্থনা করা। অর্থাৎ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগে উক্ত বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা এবং দুআ করা যে, হে আল্লাহ! যেভাবে এই কাজ করলে আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ হবে, সেইভাবে কাজটি করার তাওফীক দান করুন। তার জন্য সহায়ক সকল আসবাবের ব্যবস্থা আপনি করে দিন এবং আমার মনকে সেইদিকে ঝুঁকিয়ে দিন। আর যেভাবে করলে অকল্যাণ হবে, সেভাবে করা থেকে আমাকে বিরত রাখুন এবং আমার মনকে আপনার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট করে দিন। মনের দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা দূর করে দিন।
দুই রাকাত নামায পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো বিশেষ একটি দুআর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ চাওয়াকে ইসতিখারা বলে। ইসতিখারা করা সুন্নাত। দ্বীন-দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কাজ এবং যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কর্তব্য হল-

প্রথমে আল্লাহ প্রদত্ত আকল ও বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করা। সেই কাজ ও সিদ্ধান্তের নানা দিক বিবেচনা করে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং উপকারী-অনোপকারী বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা।

এরপর দুই রাকাত নামায পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দুআর মাধ্যমে ইসতিখারা করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা।

এর সঙ্গে সঙ্গে আপনজন, ঘনিষ্ঠজন, হিতাকাক্সক্ষী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মশওয়ারা বা পরামর্শ করা।

ইসলামী শরীয়তে মশওয়ারার গুরুত্বও অনেক। কুরআনুল কারীমে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে-

وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

অর্থাৎ (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) আপনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মশওয়ারা করুন। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৯

অন্য এক আয়াত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তাঁদের বিষয়াবলী পারস্পরিক মশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়। -সূরা শূরা (৪২) : ৩৮

‘ইস্তিখারার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এত গুরুত্ব দিতেন যাতে মনে হতো যে, কুরআন শিক্ষার জন্য তিনি তালীম দিচ্ছেন। ইস্তিখারার পর মন যেদিকে টানবে, সেটাই করবে। আর এরই মধ্যে রয়েছে কল্যাণ ও রহমত ইনশা আল্লাহ। স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা লাগবে না। এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখাও জরুরি নয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইসতিখারার আমল শিক্ষা দিয়েছেন।

সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السّورَةَ مِنَ القُرْآنِ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের সূরা যেভাবে শেখাতেন, সকল বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে) সেভাবে ইসতিখারা করতে শিখিয়েছেন।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৬৬

সময়: যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

রাকাআত: ২।

(৮)তাহিয়্যাতুল অযুর নামাজ:

ওযু এবং গোসলের পর এ সালাত আদায় করতে হয়। অন্যান্য নফল সুন্নাতের মতোই এ দু'রাকআত সালাত। যখনই ওযূ বা গোসল করবে ওযু-গোসল শেষে তখনই দু'রাকআত এ সালাত আদায় করা। আর এ সালাত দিনে ও রাতে যেকোন সময় আদায় করা যায়।
অজু করার পর এই দুই রাকাত নামাজ পড়া হয়, যা অজুর প্রতি সম্মান জানানোর একটি পদ্ধতি।

রাকাআত : ২

ফজিলত:

নবী (স) একদিন ফজরের সালাতের সময় বেলাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন,
" হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তুমি এমনকি আমল কর যা সর্বাধিক সন্তোষজনক? কেননা, আমাকে যখন (মিরাজের রাতে) জান্নাত দেখানো হলো তখন আমি সেখানে তোমার জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটার আওয়াজ পেয়েছি। দিনে-রাতে তুমি এমন কি আমল কর (যা তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে অধিকতর আশ্বস্ত করে?) উত্তরে বেলাল (রা) বললেন, রাতে বা দিনে যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন (অর্থাৎ ওযু বা গোসল) করি তখনই দুই রাকআত (তাহিয়্যাতুল ওযূর) সালাত আদায় করি।"(বুখারী: ১১৪৯)

নবী (স) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার মতো করে ওযু করে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, মনে অন্য কোন চিন্তা আনবে না, আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (বুখারী: ১৬৪)।

যেকোন মুসলিম সুন্দর করে ওযু করে অন্তর ও চেহারা পূর্ণ মনোনিবেশ করে দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল ওযূর) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।(মুসলিম, সলাতুল মুমিন পৃ. ১/৩৮৬)

‘উকবাহ্ ইবনু ‘আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমার ওপর উট চড়ানোর দায়িত্ব ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, “যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু রাক’আত সলাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। ‘উকবাহ্ বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলামঃ বাহ! হাদীসটি কত চমৎকার! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরও উত্তম। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি ‘উমার। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি, এ মাত্র এসেছো। রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগে বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযু করে এ দু’আ পড়বে- “আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ”। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।
সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৪১

(৯)যাওয়ালের নামাজ:

দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলার পর ৪ রাকাআত নফল নামাজ আদায় করা হয়, তাকে যাওয়ালের নামাজ বলা হয়।রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এই নফল নামাজ আদায় করতেন।

রাকাত:৪

ফজিলত:

এ সময় আল্লাহ “রাসূল (ﷺ) পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করতেন। বলতেনঃ এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উত্থিত হোক তা আমি ভালবাসি।” - ইবনে মাজাহ ১১৫৭

(১০)সালাতুত তাসবীহ:

সালাতুত তাসবীহ হলো একটি বিশেষ নফল নামাজ, যা "তাসবিহ" বা আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য পাঠের মাধ্যমে আদায় করা হয়।

ফজিলত :

আব্দুর রহমান ইবন বিশর (রহঃ) ..... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বলেনঃ হে আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্বাস! হে আমার প্রিয় চাচা! আমি কি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেব না যার মাধ্যমে আপনি দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন? যখন আপনি এরূপ করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। চাই তা প্রথম বারের হোক বা শেষ বারের পুরাতন হোক কিংবা নতুন হোক, ভুলেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, বড়ই হোক অথবা ছোট, প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে- আপনি এই দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, যদি আপনি চার রাকাত নামায নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর এর সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবেন। অতঃপর যখন আপনি কিরাআত পাঠ শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় এই দু'আ পাঠ করবেনঃ 'সুবহানালল্লাহ আলহামদু লিলল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।'

অতঃপর আপনি রুকূ করবেন এবং সেখানেও ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। পরে রুকূ হতে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজদায় গিয়েও তা দশবার পাঠ করবেন এবং প্রথম সিজদার পর মাথা তুলে বসবার সময় ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায়ও তা দশবার পাঠ করবেন, পরে সিজদা হতে মাথা তুলে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকার পর দাঁড়াবেন (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য)। অতঃপর আপনি প্রতি রাকাতে এরূপ পঁচাত্তর বার ঐ দু'আ পাঠ করবেন এবং এরূপ চার রাকাত নামায আদায় করবেন। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তবে আপনি এই নামায দৈনিক একবার আদায় করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় হবে প্রতি মাসে একবার; যদি তাও অসম্ভব হয়, তবে প্রতি বছরে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে গোটা জীবনে অন্ততঃ একবার আদায় করবেন। ইবনু মাজাহ– (১৩৮৬)।

(১১)সালাতুল ইস্তিস্কা:

অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দিলে আল্লাহর কাছে পানি চেয়ে বৃষ্টির জন্য যে সালাত আদায় করতে হয় সে সালাতকে বলা হয়- বৃষ্টির সালাত বা 'সলাতুল ইস্তিস্কা'। এ সালাত আদায় করা সুন্নাত।

অনাবৃষ্টি, খরা ও দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে তখন এ সালাত আদায় করা সুন্নাত (মুগনী- ৩/৩৩৪)। আর খরা, অনাবৃষ্টি ও দূর্ভিক্ষের কারণ হলো পাপ কাজ বেড়ে যাওয়া। (ইবনে মাজাহ: ৪০১৯)।
দুঃসময় ও বিপদে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার বিশেষ নামাজ।

আবদুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন আসেম আল-মাযেনী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন। আর নিজের চাদর উল্টিয়ে নিলেন । অতঃপর তিনি দুই রাকআত সলাত আদায় করলেন। তাতে তিনি উঁচু আওয়াজে কিরাআত পড়লেন। অপর শব্দে ঈদ গাহের দিকে বের হলেন।
[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

(১২)দুখুলুল মাসজিদ নামাজ:
দুখুলুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ হলো মসজিদে প্রবেশ করার পর বসে পড়ার আগে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা। এটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত একটি সুন্নাত। আবূ কাতাদাহ্ সালামী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

"আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।"
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪৪

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্য্য গ্রহণ হলো। তখন তিনি একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে প্রেরণ করলেন: সালাতের জন্যে উপস্থিত হোন। তারা একত্র হলো এবং তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি তাকবীর বললেন, দুই রাকা'আতে চারটি রুকু' ও চারটি সেজদা আদায় করলেন"।

[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

(১৩)চন্দ্র ও সূর্য গ্রহনের নামাজ :

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সূর্য গ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের নিয়ে সূর্যগ্রহণের সালাত পড়েন। তাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন, তারপর দীর্ঘ রুকূ করেন, তারপর রুকূ থেকে উঠেও দীর্ঘ কিয়াম করেন, এ ছিল প্রথম কিয়ামের থেকে কিছুটা কম। অতঃপর সাজদায় গিয়ে দীর্ঘ সাজদাহ করেন, অতঃপর পরবর্তী রাকা‘আতে তাই করেন যা প্রথম রাকা‘আতে করে থাকেন। তারপর তিনি সালাম ফিরান অথচ সূর্য তখন পরিস্কার হয়ে পড়লো। তারপর তিনি মানুষকে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করার পর বললেন। চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন। কারো মারা যাওয়া বা জন্ম হওয়ার কারণে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা তা দেখো আল্লাহকে ডাকো, তাকবীর বলো, সালাত আদায় করো এবং সাদকা করো। তারপর তিনি বলেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদ কেউ আল্লাহর চাইতে অধিক ঈর্ষান্বিত নয় যে, একজন তার গোলামের সাথে বা বাঁদীর সাতে ব্যভিচার করবে। হে উম্মাতে মুহাম্মাদ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাঁসতে এবং অধিক কাঁদতে। অপর শব্দে বর্ণিত: তারপর তিনি চার রাকা‘আত এবং চার সাজদাহ পূর্ণ করেন।
[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]
আবূ মূসা আল আশ‘আরী রাদয়াল্লাহু আনহু হতে র্বণতি। তিনি বলনে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইইহ ওয়াসাল্লামের যুগে র্সূযগ্রহণ হল, তখন তিনি ভীত অবস্থায় উঠলনে ও কিয়ামত সংঘটিত হবার ভয় করতে লাগলেন, অবশেষে তিনি মাসজিদে আসেন ও দাঁড়িয়ে যান এবং সবচেয়ে দীর্ঘ কিয়াম ও সাজদা দ্বারা সালাত আদায় করেন। আমি কখনো তাকে তার সালাতে এরূপ করতে দেখেনি। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো হল নিদর্শন যা আল্লাহ্ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ্ তা‘আলা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত অবস্থায় আল্লাহর যিকির, দু‘আ ও ইস্তিগফারের দিকে ধাবিত হবে।
[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

আবূ মাস‘ঊদ উকবা ইবন আমর আল-আনসারী আল-বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত: “নিশ্চয় চন্দ্র ও সুর্য্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। এ দুটি দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন। কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। আর দো‘আ করতে থাকবে যতক্ষণ না দূর হয়ে যায়”।
[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

২.৪ নফল নামাজের সময়

নামজের নিষিদ্ধ সময়:
তিন সময়ে নামাজ পড়ার নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত রয়েছে।
ক.সূর্যদয়ের সময়
খ.যখন সূর্য ঠিক মাথর উপরে থাকে
গ.সূর্য যখন অস্ত যায়
উকবা বিন আমের জুহানী রদ্বিআল্লহু আনহু বলেন,
“তিনটি সময়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন।সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ না পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়।সূর্য মধ্য আকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর সূর্য অস্ত যায়।”[সহীহ মুসলিম১৩৭৩]

নফল নামাজের মাকরূহ সময়:

১।সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাকআত - সুন্নত ছাড়া অন্য নফল নামাজ পড়া মাকরুহ।চাই তা ঘরে হোক কিংবা মসজিদে অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়্যাতুল অযু বা দুখুলুল মাসজিদ পড়া অনুচিত।তবে ফজরের সুন্নাতের সাথে তাহিয়্যাতুল অযু বা দুখুলুল মাসজিদ নামজের নিয়তে পড়ে নিলে সওয়াব পাওয়া যাবে ইংশা আল্লাহ। জামাতের সময় হওয়া পর্যন্ত যিকির আযকার ইত্যাদি করতে থাকবে।
হযরত হাফসা রদ্বিআল্লহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ পড়তেন না।[সহিহ মুসলিম ১৭১১]

ইমাম তিরমিজি রহি. বলেন,
আহলুল ইলম একমত যে, ফজরের সময় থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ পড়াকে মাকরূহ মনে করেন।[তিরমিজি ৭৫]
অতএব,ফজরের ফরজ নামাজের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল নামাজ পড়া মাকরূহ।

২।আসর নামাজের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরূহ।

আবু সাঈদ খুদরী রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,
ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্যদয় পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই।আসরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই।[সহীহ বুখারী ৫৫১]
বি:দ্র:উপরোক্ত সকল মাকরূহ সময়ে কাযা নামাজ, জানাজার নামাজ,সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ নয়।[ফিকহুল ইবাদা লিল হাবালি]
আবার কেউ যদি ঐ দিনে আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫১৭

৩।মাগরিবের আযানের পর থেকে মাগরিবের নামাজ পড়ার পূর্বে কোনো নফল, সুন্নত নামাজ পড়া মাকরূহ।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
“প্রতি দুই আযান(আযান ও ইকামত) এর মাঝে (নফল) নামাজ আছে মাগরিব নামাজ ছাড়া। [বায়হাকী ৪১৭২]

প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝামাঝি দুই রাকাত নামাজ পড়া নফল।আবশ্যক নয়।শুধু মাগরিবের নামাজের ক্ষেত্রে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থ্যাৎ মাগরিবের আযানের দিলে ফরজের আগে কোনো নামাজ নেই।

তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-কে মাগরিবের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আমি কাউকে এ সলাত আদায় করতে দেখিনি। তবে 'আসরের পরে দু' রাক'আত সালাত আদায়ের অনুমতি আছে।
[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১২৮৪]

৪।ইমাম যখন জুমা- ঈদের খুতবার জন্য বের হন তখন থেকে ফরজ নামাজ থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরূহ।

হযরত উরওয়া রদ্বিআল্লহু আনহু বলেন,
"ইমাম মিম্বারে বসলে কেউ কোনো নামাজ পড়বে না"[ইবনে আবী শাইবা ৫২১৩]

৫।ইকামতের সময় : নামাজের ইকামত শুরু হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া অন্য নামাজ পড়া মাকরূহ।
আবু হোরায়রা রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত,
"যখন নামাজ শুরু হয় তখন ফরজ নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ নেই।"[তিরমিজি ৪২১]

৬।ঈদের নামাজের আগে নফল নামাজ পড়া এবং পরে(ঈদগাহে)পড়া মাকরূহ।
ইবনে আব্বাস রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত,
"রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন।এবং দু রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোনো নামাজ আদায় করেননি।[সহীহ মুসলিম ১৯৪৪]

৭।আরাফার ময়দানে বিশেষ করে হজ্ব যাত্রীদের জন্য যোহর এবং আসর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়া মাকরূহ।
মুজদালিফায় বিশেষ করে হজ্ব যাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে।

জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাহর ময়দানে এক আযান ও দুই ইক্বামাতে যুহর ও 'আসরের সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু এ দুই সলাতের মধ্যখানে কোনো (নামাজ) তাসবীহ পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করেছেন এবং দুই সলাতের মাঝখানে কোন (নামাজ) তাসবীহ পড়েননি।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৯০৬

৮।খুব ক্ষুধা ও খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ঐ অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরূহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গে মন লেগে থাকে নামাজের সঙ্গে নয়।[সহীহ মুসলিম ৮৬৯]

৯।প্রসাব পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে নামাজ পড়া মাকরূহ।

হিশাম ইবনু উরওয়া (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে থেকে বর্ণিতঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আল-আরক্বাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি (উরওয়া) বলেন, একদা নামাযের ইকামাত হয়ে গেল। তিনি (আব্দুল্লাহ) এক ব্যক্তির হাত ধরে তাকে সামনে ঠেলে দিলেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাম) স্বীয় গোত্রে ইমাম ছিলেন (নামায শেষে)। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ "নামাযের ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নেবে।"[তিরমিজি ১৪২]

১০।এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে, যে বস্তু নামাজ থেকে বিমুখকারী এবং খুশু খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টি কারী।

অধ্যায় ৩: কুরআন ও হাদীসে নফল নামাজের গুরুত্ব

৩.১ কুরআনের আলোকে নফল নামাজের গুরুত্ব

নফল নামাজ ইসলামের এক অনন্য ইবাদত। এটি ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদতগুলোর একটি। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে নফল বা অতিরিক্ত ইবাদতের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও ফলাফল স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
নফল নামাজ আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যেম।আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

“আর রাতের কিছু অংশে জেগে ওঠো নামাজের জন্য — এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত; হয়তো তোমার রব তোমাকে মহা মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।”
— সূরা আল-ইসরা (১৭:৭৯)

এ আয়াতে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে ফরজ নামাজের বাইরে অতিরিক্ত নফল নামাজ (তাহাজ্জুদ) আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটি আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা ও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে বর্ণিত।তিনি আরো বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ
قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ
نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ
اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

“হে বস্ত্রাবৃত (নবী)!রাতে জেগে থাক (রাত জেগে এবাদত করো), একটু সময় ব্যতীত। রাতের অর্ধেক, অথবা তার থেকেও একটু কমাও।কিংবা তার চেয়ে (কিছু) বাড়াও; আর স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াত কর।”[সুরা মুযাম্মিল আয়াত ১-৪]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

“যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে শান্ত হয় — জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”
— সূরা আর-রাদ (১৩:২৮)

নফল নামাজ হলো আল্লাহর স্মরণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এতে মন ও আত্মা শান্তি লাভ করে।

“যারা আমাদের পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করব; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।”— সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৬৯)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

“নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহ মুছে ফেলে।”
— সূরা হুদ (১১:১১৪)

ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। পবিত্র কোরআনে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

تَتَجَافٰي جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۡ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ
“তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।” (সুরা সিজদা : ১৬)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

“তারা রাতে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা সাজ্‌দা করে”।[সুরা আলে ইমরান আয়াত:১১৩]

তিনি আরো বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

“এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী”[সুরা আলে ইমরান আয়াত :১৭]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

“অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।” [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الاعلا: ١٤، ١٥]

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৫]

সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢]

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

“সেজদা করো এবং (নামাজের মাধ্যমে) তোমার প্রভুর নিকটে হও।”
— সূরা আল-আলাক (৯৬:১৯)

এখানে সেজদা ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নফল নামাজ হলো সেই মাধ্যম, যা বান্দাকে আল্লাহর আরও কাছে নিয়ে যায়।

৩.২ হাদীসের আলোকে নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহ তা'আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন জরুরী, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত জরুরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয নামাজের ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ হবে নফল নামাজ দ্বারা।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,
"কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয়, তাহলে সে সফল হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
যদি ফরজ সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহলে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না? তখন নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্য আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে।" (তিরমিজি, হাদিস : ৪১৩)
নফল সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,
"আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয় বান্দার সঙ্গে শত্রুতা করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরজ করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নেই।বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি।" (বুখারি, হাদিস : ৬৫০২)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য। জান্নাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে, যারা অধিক হারে নফল সালাত আদায় করবে।

রবিআ বিন কাব (রা.) বলেন,

“আমি রাতের বেলা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম এবং অজুর পানিসহ অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বলেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বলেন, এ ছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বলেন, তুমি বেশি বেশি সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করো।” (মুসলিম, হাদিস : ৯৮১)

নফল নামাজ মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নফল নামাজ।

মা‘দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম,

“আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন।” [মুসলিম ৪৪৮; মিশকাত, ৮৯৭]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

“কোনো বান্দা যখনই আল্লাহকে একটি সিজদা করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্যে একটি নেকি লিখে দেন, তার একটি পাপ মিটিয়ে দেন এবং তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাই তোমরা বেশি পরিমাণে সিজদা করো।” -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪২৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللّيْلِ، فَصَلّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّيْلِ، فَصَلّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلّى، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির ওপর যে রাতে ঘুম হতে জেগে নামায আদায় করে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়, অতঃপর সেও নামায আদায় করে। স্ত্রী যদি জাগতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যেন তার মুখম-লে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ রহম করুন ঐ স্ত্রীলোকের ওপর যে রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হয় ও নামায আদায় করে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। স্বামী যদি জাগতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যেন তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। - মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৪১০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৪
অপর এক হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. ও আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-
إِذَا أَيْقَظَ الرّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللّيْلِ فَصَلّيَا، أَوْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذّاكِرِينَ وَالذّاكِرَاتِ.
কোনো ব্যক্তি যখন রাতের বেলায় নিজ স্ত্রীকে জাগ্রত করে উভয়ে দুই দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে তাদেরকে 'যাকেরীন' তথা আল্লাহর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯)

৩.৩ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমল ও শিক্ষা

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের অনুসরণ করা অতীব জরুরি। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ط

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে,তাদের জন্য তো আল্লাহর রসূলের মাঝে উত্তম এক আদর্শ রয়েছে।"[সুরা আল-আহজাব আয়াত ২১]
অন্য আয়াতে বলেন,
فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْم ٌ ۝

“সুতরাং যারা রাসুলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে,তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[সুরা আন -নুর আয়াত:৬৩]

রাসূল (সা.) নফল নামাজে খুবই নিয়মিত ছিলেন এবং তিনি নফল ইবাদতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন তিনি তাঁর উম্মতদেরকেও নফল নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।এছাড়া যখনই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ،صَلَّى.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।”সুনানে আবু দাউদ, হাদীস **১৩১৯**

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের বর্ণনা দেন, তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন এবং একশত আয়াত পড়লেন। তিনি রুকু না করে সামনে চললেন। আমি ভাবলাম তা তিনি দু’রাকআতে শেষ করবেন ও তারপর তিনি রুকু করবেন। তিনি চলতে থাকলেন, এমন কি সূরা নিসা শেষ করলেন। অতঃপর সূরা আলে ইমরান। তারপর তিনি রুকু করলেন তার কিয়ামের কাছাকাছি সময় নিয়ে। তিনি রুকুতে বলছিলেনঃسُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম), পরে তিনি তাঁর মাথা ওঠালেন এবং বললেনঃ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْد (সামি’য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ), এরপর কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদা করলেন এবং সিজদা লম্বা করলেন। আর সিজদায় বলছিলেনঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা, সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা, সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা), তিনি আল্লাহর ভয় অথবা তাযীমের-আয়াতে পৌছলেই তাঁকে স্মরণ করতেন। (বায়হাকী)।

অন্য হাদীসে এসেছে যেঃ তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন, সূরা বাকারা পাঠকালে যখন রহমতের আয়াতে পৌঁছেন, তখন তিনি তথায় থেমে রহমত কামনা করেন এবং যখন কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছেন, তখন তিনি তথায় থেমে আযাব হতে মাগফিরাত কামনা করতেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকুতে অতিবাহিত করেন (মুসনাদে আহমাদ)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায ও আল্লাহর সমীপে দন্ডায়মান হওয়ার প্রতি ভালোবাসার কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়..., বস্তুত তিনি যখন একা নামায পড়তেন তখন অনেক লম্বা সময় নিয়ে নামায আদায় করতেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করা সম্পর্কে আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত বেশি নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।”

এ দেখে আয়েশা রা. নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে!

নবীজী বলেন-

أَفَلاَ أُحِبّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.

আমার কি উচিত নয় যে, আমি একজন পূর্ণ শোকরগুজার বান্দা হব?” -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২০

প্রিয় নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুরো জীবনটাই রচিত হয়েছে আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত ও আনুগত্যে।তার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর। [সুরা আল ইনসান আয়াত ২৬]
আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন সলাত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন: যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে, তা ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে না, তার জন্য এটা জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। ক্বিয়ামাতের দিন সে কারূন, ফির‘আওন, হামান ও উবাই বিন খালাফ-এর সাথে থাকবে।[মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮]
উবাইদ বিন উমাইর রদ্বিআল্লহু আনহু হতে বর্ণিত আছে,
“একবার আয়শা রদ্বিআল্লহু আনহা কে বলেন, ‘রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন বিষয়টি আপনার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছে?’তাটপর তিনি বলেন, ‘ এক রাতে তিনি আমাকে বললেন, “হে আয়িশা, আমাকে ছাড়ো।এ রাতে আমি আল্লাহর ইবাদত করবো।” আমি বললাম, “ আল্লাহর শপথ, আমি আপনার নৈকট্য ভালোবাসি এবং ওই জিনিসকেও ভালোবাসি, যা আপনাকে আনন্দিত করে।” তারপর তিনি উঠে পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজে কাঁদতে লাগলেন। তার চিবুক ভিজে গেল।তিনি কাঁদতে থাকলেন। একসময় তার দাঁড়ি ভিজে গেল। তারপর বিলাল রদ্বিআল্লহু আনহু ফজরের আজান দিতে এলেন।রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাঁদতে দেখে বিলাল রদ্বিআল্লহু আনহু বললেন, “ হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কাঁদছেন কেন?আপনার তো আগে পরে সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।”তিনি বললেন, “ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?আজ রাতে আমার উপর একটা আয়াত নাযিল হয়েছে,যে এ আয়াত তিলাওয়াত করল,কিন্তু এর মর্ম নিয়ে চিন্তা করল না, তার জন্য ধ্বংস।

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ

আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।(সুরা আলে ইমরান - ১৯০)
[সহিহু ইবনে হিব্বান :৬২০]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং রাতের শেষভাগে উঠে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন। [সহীহ - [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম]

৩.৪ সাহাবায়ে কেরামের নফল নামাজে আগ্রহ ও আমল

হযরত জাবের রদ্বিআল্লহু আনহু বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিত নাখল নামক স্থানের দিকে যাতুর রিকা যুদ্ধের জন্য বাহির হলাম।একজন মুসলমান এক মুশরিকের স্ত্রীকে কতল অথবা বন্দী করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ফেরত আসলেন তখন সেই মহিলার স্বামী আসলো। সে কোথাও গিয়েছিলো। যখন সে স্ত্রীর কতল হওয়ার সংবাদ পেলো তখন কসম করলো যে, যতক্ষণ সে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের রক্ত না বহাবে ততক্ষণ সে ক্ষান্ত হবে না। সুতরাং সে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছন পিছন চললো।
রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে একজায়গায় দাঁড়ালেন এবং বললেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহারাদারি করবে? একজন মুহাজির ও একজন আনসারী নিজেদের কে পাহারার জন্য পেশ করলেন এবং তারা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমরা পাহারা দিবো। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে এই পাহাড়ী পথের মুখে চলে যাও। তারা দুইজন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রদ্বিআল্লহু আনহু ও হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রদ্বিআল্লহু আনহু ছিলেন। উভয়ে পাহাড়ী পথের মুখে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে আনসারী মুহাজির কে বললেন, (আমরা পালাক্রমে পাহারা দিবো, অতএব) তুমি বলো, আমি কখন পাহারা দিবো- রাতের প্রথম অংশে না, শেষ অংশে? মুহাজির বললেন তুমি বরং রাতের প্রথমাংশে পাহারা দাও।
সুতরাং মুহাজির শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, আর আনসারী দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। সেই ব্যক্তি (যার স্ত্রী কতল হয়ে গিয়েছিলো) আসলো। যখন সে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলো তখন সে মনে করলো এই ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীর গুপ্তচর হবে। সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো যা আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হলো। তিনি তীর বাহির করে ফেলে দিলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন। সেই (কাফের) দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করলো। সেটিও আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হলো। তিনি সেটাও বাহির করলেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে থাকলেন। উক্ত ব্যক্তি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করলো। সেটিও এসে আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হলো এবং তিনি বাহির করে ফেলে দিলেন। তারপর রুকু ও সেজদা করে নামাজ শেষ করলেন এবং নিজের সঙ্গী কে জাগাই বললেন, উঠে বস, আমি তো আহত হয়ে গেছি। মুহাজির দ্রুত উঠে

দাঁড়ালেন। উক্ত (কাফের) ব্যক্তি যখন (একজনের স্থালে) দুইজনকে দেখলো তখন বুঝলো যে, তারা উভয়ে তার ব্যাপারে টের পেয়েছে, অতএব সে পালিয়ে গেলো।
মুহাজির যখন আনসারীর শরীর থেকে রক্ত বের হতে দেখলেন তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! যখন সে আপনাকে প্রথম তীর মারলো তখন কেনো আমাকে জাগালেন না? আনসারী বললেন, আমি একটি সূরা পড়তেছিলাম, আমার মন চাইলো না যে, সেটা শেষ না করে ছেড়ে দেই। কিন্তু সে যখন একের পর এক তীর মারতে লাগলো তখন আমি নামাজ শেষ করে আপনাকে জাগিয়েছি। আল্লাহ কসম রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানের পাহারার হুকুম দিয়েছিলেন সেটার পাহারার কাজ নষ্ট হওয়ার আশংকা না হতো তবে আমার জান চলে গেলেও আমি সেই সূরাকে শেষ না করে ছাড়তাম না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) বললেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ডেকে বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান নুবাইহ্ হুযালী আমার উপর আক্রমণ করার জন্য লোকদের কে সমবেত করতেছে। বর্তমানে সে উরনা নামক স্থানে আছে। তুমি যাও এবং তাকে কতল করে আসো। আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি আমাকে তার কোনো আলামত বলে দেন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি যখন তাকে দেখবে তখন তোমার শরীরে শিহরণ অনুভব করবে।
আমি গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে রওনা হলাম। আমি যখন তার নিকট পৌঁছালাম তখন সে তার স্ত্রী গণের সঙ্গে উরনা নামক স্থানে অবস্থান করতেছিলো এবং নিজের স্ত্রীদের জন্য থাকার জায়গা তালাশ করতেছিলো। তখন আসর নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন তাকে দেখলাম রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা অনুযায়ী সত্যি আমি আমার শরীরে শিহরণ অনুভব করলাম। আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হলো যে, তাকে কতল করার চেষ্টায় দেরি হয়ে যায় আর আসর নামাজের সময় চলে যায়। অতএব আমি নামাজ শুরু করলাম।
আমি তার দিকে হাটঁতেছিলাম আর ইশারায় রুকু ও সেজদাহ করতেছিলাম। এইভাবে (নামাজ আদায় করে) আমি যখন তার নিকট পৌঁছালাম তখন সে বলল, এই ব্যক্তি কে ? আমি বললাম, আরব দেশীয় এক ব্যক্তি, যে শুনতে পেয়েছে, তুমি নাকি ঐ ব্যক্তি যে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকদের সমবেত করতেছো ? এই কাজের জন্য তোমার কাছে এসেছি । সে বলল, হ্যাঁ আমি এই কাজে লিপ্ত আছি । সুতরাং আমিতার সাথে কিছুক্ষন হাঁটলামহাঁটলাম তারপর যখন আমি তাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলাম তখন তলোয়ারের আঘাতে তাকে কতল করে দিলাম এবং হাওদায় বসা তাদের স্ত্রীদেরকে এই অবস্থায় রেখে আসলো যে তারা তার প্রতি ঝুকে রয়েছে যখন

আমি রসুলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছালাম তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন তুমি ঠিক বলেছ। তারপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে উঠলেন এবং আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে একটি লাঠি দিয়ে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস একে নিজের কাছে হেফাজতে রাখিও।

আমি লাঠি নিয়ে লোকদের নিকট বাহিরে আসলাম। লোকেরা জিজ্ঞেসা করল, এটা কিসের জন্য? আমি বললাম, এই লাঠি আমাকে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং আমাকে এটা হেফাজত করে রাখতে হুকুম করেছেন।লোকেরা বলল,তুমি ফিরে যাও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই ব্যাপারে কেনো জিজ্ঞাসা করে নেও না? রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গেলাম এবং আরোজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এই লাঠি কেন দিয়েছেন? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এটা আমারও তোমার মধ্যে চিহ্ন চিহ্ন হবে। কেননা সেদিন লাঠিওয়ালা লোক অনেক কম হবে।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাঃ সেই লাঠিকে নিজের তলোয়ারের সাথে বেঁধে এবং উহা সারা জীবন তাহার সঙ্গে রহিল যখন তাহার ইন্তেকাল হলো তখন তার অনুযায়ী সেই লাঠি তাহার কাফনের ভিতর রেখে দেওয়া হল এবং ওটাকে তার সাথে দাফন করা হলো।

হযরত ওরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়ার মুখের যুদ্ধের দিন যখন উভয় বাহিনী পরস্পর নিকটবর্তী হলো তখন রুমি সেনাপতি কুবকুলার একজন আরবদেশীয়কে গুপ্তচর হিসেবে পাঠালো। এই হাদিসের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে,কুলার সেই গুপ্তচর কে জিজ্ঞাসা করল সেখানে কি দেখে আসছো? সে উত্তরে বলল,মুসলমানগন রাত্রিবেলায় ইবাদত গুজার এবং দিনের বেলায় ঘোড়সওয়ার।
আবু ইসহাক রহমতুল্লাহ হতে এক দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা শুধু পরাজিত হচ্ছো? তাদের বড় বড় সরদারদের মধ্যে হতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলল, আমরা এই জন্য পরাজিত হই যে,মুলমানগণ রাতভর এবাদত করে এবং দিনভর রোজা রাখে।

অধ্যায় ৪: নফল নামাজের আত্মিক ও মানসিক প্রভাব

৪.১ আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া বৃদ্ধি

ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল সালাত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ.

কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের মাধ্যমে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৬

হযরত উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إِنّ أَهَمّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে। -মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮

সালাত মূলত খোদাপ্রদত্ত এক মহান নিআমত। রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ উপহার, যা বান্দাকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, পাপাচার, প্রবৃত্তিপূজা, ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত করে পূত-পবিত্র ও উন্নত এক আদর্শ জীবনের অধিকারী বানিয়ে দেয়। বিকশিত করে তোলে তার ভেতরের সকল সুকুমারবৃত্তি। তার জন্য খুলে দেয় চিরস্থায়ী জান্নাতের সুপ্রশস্ত দুয়ার।

সালাত হচ্ছে হিকমাহপূর্ণ এক অলৌকিক তরবিয়ত-ব্যবস্থা। সালাতের মাধ্যমেই ইখলাস, আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা বান্দাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে।

সালাত এমন এক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পূর্ণ যে, খাঁটি মুসল্লি নামাযের বাইরের পরিবেশেও এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা মানুষের দৃষ্টিতে সালাতের ভাব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। অদৃশ্য থেকে মূলত সালাতই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তার রাত-দিনের সকল গতিবিধি। শয়তানের ধোঁকায় যদি মুসল্লি কখনো কোনো অন্যায় বা অশোভনীয় কাজে লিপ্ত হতে চায় তখন নামাযের তরবিয়তে দীক্ষিত বিবেক তাকে বলে, তুমিই বল, একটু পরে যখন তুমি সালাতে তোমার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবে তখন কি তোমার এই ভেবে লজ্জাবোধ হবে না যে, কেমন কালো মুখ ও কলুষিত হৃদয় নিয়ে তুমি আপন মালিকের

সামনে দাঁড়াচ্ছ? যিনি অন্তর্যামী, তোমার গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। যিনি ছাড়া তোমার আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি তোমার একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাঁর সামনে তোমাকে বার বার দাঁড়াতে হবে। যার কাছে তোমার সকল চাওয়া-পাওয়া। প্রতিটি মুহূর্তে তুমি যাঁর মুখাপেক্ষী। এগুলো জানার পরও কি তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে? সালাত এভাবে মুসল্লিকে উপদেশ দিতে থাকে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়।
আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। -সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫
ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলূসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কেরাত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ও রুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে সালাত। এ কারণে সালাত যেন মুসল্লিকে বলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না। তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করো না, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্য হবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছ, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। এরপরও যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। (আর স্ববিরোধী কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্ স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে।) -রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২
প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত নামাযে প্রতি রাকাতে বান্দাহ বলতে থাকে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

[(তুমি) কর্মফল-দিবসের মালিক।] আর তার স্মরণ হতে থাকে, তাকে কাল কর্মফল দিবসে মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং তাঁর নাফরমানী থেকে, তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হবে। কোনো গুনাহ যদি নামাযের আগে হয় তাহলে তার গুনাহের কথা স্মরণ হয় ও লজ্জাবোধ হয়; বান্দা অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করে। তেমনি যদি কোনো গুনাহের নিয়ত থাকে তখন বান্দার মনে হয়, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো; কাল কিয়ামতের দিনও তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাহলে কীভাবে আমি নামাযের পর অমুক গুনাহ করার কথা ভাবতে পারি! এভাবে নামায বান্দাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে, কৃত গুনাহ থেকে পবিত্র করে।
তেমনিভাবে আমরা নামাযের শুরুতে যে ছানা পড়ি-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمّ وَبِحَمْدِكَ...

এখানে পড়ার আরেকটি দুআও রয়েছে, যে দুআর মধ্যে বান্দা গুনাহ থেকে দূরে থাকার তাওফীক প্রার্থনা করে-

اللّٰهُمّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ...

(হে আল্লাহ! পূর্ব-পশ্চিমের যেমন দূরত্ব; আমার মাঝে আর গুনাহের মাঝে তুমি তেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।)

তো বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে, তখন অবচেতনেই সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। এভাবে সালাত বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

দিনের শেষে বিত্র নামাযে আমরা দুআ কুনূত পড়ি। সে দুআতে এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যাতে বান্দা নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে, মাফ চায়, গুনাহ না করার সংকল্প করে। যেমন দুআর শুরুতেই আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বান্দা বলে-

اللّٰهُمّ إِنّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ.

(ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।)
দিন শেষে বান্দা যখন গাফূরুর রাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তো বান্দার সারাদিনের সকল পাপের কথা স্মরণ হয়ে যায়। সাথে ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প ব্যক্ত করে। কারণ, কৃত গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য প্রধান শর্তই হল, ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর না করার সংকল্প।

একপর্যায়ে বান্দা বলে-

نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ.

(আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; অকৃতজ্ঞ হই না।)
রবের নাফরমানীর চাইতে বড় অকৃজ্ঞতা আর কী হতে পারে!
সালাত বান্দাকে শুধু রবের নাফরমানী থেকেই বিরত রাখে না; বরং নাফরমান থেকেও দূরে রাখে। দুআ কুনূতে বান্দা বলে-

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يّفْجُرُكَ.

(যে তোমার নাফরমানী করে আমরা তাকে ত্যাগ করি, বর্জন করি।)
সবশেষে বান্দা সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প ব্যক্ত করে বলে-
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ.
(আমরা তোমার আযাবকে ভয় করি।)
এ সংকল্প সারাদিন বান্দাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কৃত গুনাহ থেকে তওবা করার তাকিদ দেয়। এভাবেই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, গোনাহগার থেকে নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প আর আল্লাহর আযাবের স্মরণ বান্দাকে সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

এ তো গেল দিনের শেষে বান্দার গুনাহের স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা; এ ছাড়াও প্রতি নামাযের শেষেই তো বান্দা বলে-

اللّهُمّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلَا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرّحِيمُ.

ইয়া আল্লাহ! আমি (তোমার নাফরমানীর মাধ্যমে) নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।

যে বান্দা রবের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার 'যালামতু নাফসী'-'নিজের উপর যুলুম করেছি' বলে স্বীকারোক্তি দেয় এবং হৃদয়ে তা ধারণ করে সে কি সালাতের বাইরে এ স্বীকারোক্তির বিপরীত করতে পারে? রাব্বে কারীমের, গাফূরুর রাহীমের নাফরমানী করতে পারে? এভাবেই সালাত বিরত রাখে বান্দাকে সকল অন্যায়-অনাচার থেকে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, দিনের পাঁচটি সময়ে পাঁচবার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোই তো বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। দিবস-রজনীর বিভিন্ন মুহূর্তে সে যত গুনাহ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তার গুনাহের কথা স্মরণ হয়ে যায়, সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। কারণ সে তো দাঁড়িয়েছে 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি'র সামনে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব জানেন। সে তো দাঁড়িয়েছে 'আলীমুম বিযা-তিস সুদূর'-এর সামনে, যিনি অন্তরের সংকল্পও জানেন।

এর দ্বারা যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাথেয় অর্জন হয়, সংকল্প করার তাওফীক হয় তেমনি এ কারণে গুনাহও মাফ হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

الصّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنّ.

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তার মাঝের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে আর দিনের বেলায় চুরি করে। নবীজী বললেন-

سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ.

তুমি যা বলছ (অর্থাৎ তার নামায) তা শীঘ্রই তাকে (এ অন্যায় থেকে) বিরত রাখবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৫৬০

এক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করত। যখন তার সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে বলা হল, তিনি বললেন, সালাত তার জন্যই ফলদায়ক হয়, যে সালাতের আনুগত্য করে। অতপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

নিশ্চয়ই সালাত অশোভন ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। [সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫] -মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস ৩৫৬৯৬; তাফসীরে তবারী, ১৮/৪০৮; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৯/৩০৬৬

হযরত শুআইব আ.-এর ঘটনা থেকেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসে- সালাত অন্যায় থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর নবী হযরত শুআইব আ. যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং মাপে কম দেয়াসহ সকল প্রকার অনাচার পরিহার করে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের আহ্বান জানালেন তখন তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায় তার প্রতি আপত্তি জানিয়ে বলল-

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ.

তোমার ‘সালাত’ কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্য বস্তুকে ত্যাগ করব কিংবা আমরা বিরত থাকব আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা থেকে? তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক লোক! [সূরা হূদ (১১) : ৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান রাহ. বলেন, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই সালাত (ভালো কাজের) আদেশ এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করে। -তাফসীরে তবারী ১৮/৪০৯

এভাবে আল্লাহ তাআ'লা কাছে প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং তাকওয়া বৃদ্ধি পায়।

৪.২ মন ও শরীরের প্রশান্তি

নামাজ মানুষকে মানসিক চাপ, ভয় ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখে। নামাজের সময় বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণ করে, ফলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে।কুরআনে আল্লাহ তাআ’লা বলেন:

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

“জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।(সূরা রা’দ: ২৮)

আর সম্পূর্ণ নামাজ আল্লাহর যিকির বরং নামাজ আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

“আমার যিকিরের(স্মরণের) জন্য নামায আদায় করো।” [সুরা ত্বহা আয়াত:১৪]

এজন্য মুসলিমগণ নামাজের মাধ্যমে অর্জন করে সুখ, শান্তি ও আরাম।

নামাযে তিনি যে শান্তি ও তৃপ্তি পেতেন সেকথাও বর্ণিত হয়েছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রদ্বিআল্লহু আনহু কে বলেন,

يا بلالُ، أقِمِ الصَّلاةَ، أرِحْنا بها.

“বেলাল! নামাজের ব্যবস্থা কর। নামাজের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্ত কর।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫

সর্বোপরি তিনি বলেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

“আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজে।” -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৪০

৪.৩দুঃখ-কষ্টে নফল নামাজের ভূমিকা

সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج: ١٩، ٢٣]

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

অধ্যায় ৫: নফল নামাজের ফজিলত ও পুরস্কার

৫.১ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

“আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

মা‘দান ইবনু আবী ত্বালহা আল-ইয়া‘মারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত গোলাম ছাউবান রদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম: আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বললেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজের ব্যাপারে, তখন তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এবারও চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন: “তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সিজদা করবে; কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তা’আলা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহও মাফ করে দিবেন।” মা‘দান বলেন: অতপর আমি আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে

তাকেও এ কথা জিজ্ঞেস করলে, তিনি ছাউবান রদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে যা বলেছিলেন, তিনিও সেটাই বললেন।
[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।] - [সহীহ মুসলিম - 488]

কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,
“যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের সওয়াব নষ্ট করেন না।”
— সূরা আত-তাওবা (৯:১২০)

৫.২ জান্নাত লাভের আশাবাণী

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি বললাম; ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি এবং জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেতে পারি।
তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চেয়েছো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। এরপর বললেন, সেই আমল এই যে—
আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ সম্পন্ন করবে।
এরপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, তা এই যে, রোজা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়। আর সদকা মানুষের পাপের আগুন নির্বাপিত করে দেয়। একভাইবে মানুষের গভীর রাতের সালাতও; এই বলে তিনি কোরআন মজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—শুধু তারাই আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।
তারা তাদের (দেহের) পার্শ্বগুলো বিছানা থেকে আলাদা করে (জাহান্নামের) ভীতি ও (জান্নাতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (সুরা আস-সাজদাহ, আয়াত : ১৫-১৬, তিরমিজি, হাদিস : ২৬১৬)

আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (হিজরত করে মক্কা থেকে) মদীনায় এলেন তখন লোকেরা তাঁর নিকট যেতে লাগলো এবং বলাবলি হতে লাগলোঃ আল্লাহর রাসূল এসেছেন, আল্লাহর রাসূল এসেছেন, আল্লাহর রাসূল এসেছেন (তিনবার)। আমিও লোকজনের সাথে (তাঁকে) দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমন্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। সর্বপ্রথম তাঁর মুখে আমার শোনা কথা এই যে, তিনি বললেনঃ হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, আহার করাও, আত্নীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা নামায পড়ো। শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো।
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩২৫১

উসমান ইবনে আবি শাঈবা (রাহঃ) .... উকবা ইবনে আমির আল-জুহানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে কেউ উত্তমরূপে ওযু করে দুই রাকআত নামাজ খালেস অন্তর দিয়ে আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৯০৬ (আন্তর্জাতিক নং ৯০৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে? অবহেলা করে এর কোনোটি পরিত্যাগ করবে না? মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার ওয়াদা করেছেন।
আবু দাউদ -(১৪২০)

৫.৩ গোনাহ মাফের উপায় হিসেবে নফল নামাজ

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।”
[সহীহ বুখারী - 35]

আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন যে আসরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক‘আত (নফল) সালাত আদায় করে।”

[হাসান] - [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। - এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। - এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।

আবূ দাঊদ ৯০৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮,
মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৭

হযরত মুয়াজ বিন আনাস জুহানি রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে সালাতুত দোহা পর্যন্ত মুসল্লায় বসে থাকে এবং কল্যাণকর কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলে না, তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা থেকে বেশি হয়।[আবু দাউদ,মিশকাত পৃ.১১৬]

হযরত বিলাল রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমারা তাহাজ্জুদ পড়বে, এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম,তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম,গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বাধাদানকারী। [তিরমিযি,মিশকাত পৃ.১০৯]

হযরত আবু হোরায়রা রদ্বিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের মহান রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন।যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন বলতে থাকেন- কে আছে আমাকে ডাকবে। আমি তার ডাকে সাড়া দিব।কে আছে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব।কে আছে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে,আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।[সহীহ বুখারী ১১৪৫]

অধ্যায় ৬: উপসংহার

নফল নামাজের হলো এটি ফরয নামাজের ত্রুটি পূরণ করে, আল্লাহকে নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জনে সাহায্য করে এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে। এটি দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে, গুনাহ মাফ করে এবং সওয়াবের পরিমাণ দ্বিগুণ করে। নফল নামাজ ফরয নামাজের ত্রুটি বা ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে, যাতে বান্দার ইবাদত আরও পরিপূর্ণ হয়।নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা ও গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।এটি মন ও অন্তরকে পবিত্র করে, গুনাহ মোচন করে এবং তাকওয়া বা আল্লাহভীতি তৈরি করতে সাহায্য করে।নফল নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায় এবং সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অল্প হলেও ধারাবাহিক নফল নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।নফল নামাজের পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, তাসবিহ ও দোয়াও গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদতের মধ্যে পড়ে।